সাহিত্যমেলা

বাংলা । সপ্তম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২
দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১৩
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
পঞ্চম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
ষষ্ঠ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক :
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

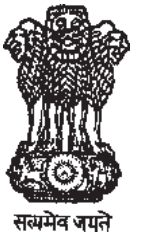

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, econnomic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

সপ্তম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের বই 'সাহিত্যমেলা' প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষাসাহিত্য পাঠ যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার মধ্যেই বিষয়ের সার্থকতা। বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিকে একত্রিত করা হয়েছে 'সাহিত্যমেলা' বইটিতে। বইটি তাই বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯— এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী 'সাহিত্যমেলা' বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রেরণা যোগাতে বাংলা বিষয়টিকে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষে যথোপযুক্ত মানসম্পন্ন বইয়ের প্রয়োজন ছিল। এই বইটিতে তথ্যের ভার যাতে সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষমতাকে কোনোভাবেই খর্ব না করে সেই দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হয় তার জন্য বইটিকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জলভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইটির একটিই উদ্দেশ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের কল্পনাশক্তি বিকশিত করা এবং লেখার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করা।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'সাহিত্যমেলা' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক- এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের 'বাংলা' বইয়ের নাম 'সাহিত্যমেলা'। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা অনুযায়ী প্রতি শ্রেণির নতুন বইয়েরই একটি নির্দিষ্ট 'ভাবমূল' (theme) আছে। সপ্তম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাবমূল হলো 'সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান'। এগারো পর্বে বিন্যস্ত এই পাঠ্যপুস্তক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যকারদের রচনায়। অন্যদিকে, অনুবাদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সাহিত্যিকের রচনা এবং ভারতীয় সাহিত্য, অর্থাৎ এদেশের অন্যান্য রাজ্যের সাহিত্যিকদের সৃষ্টি। সংস্কৃতির নানান অভিমুখ আর তার বিচিত্র প্রকাশ ধরা পড়েছে লেখাগুলির মাধ্যমে। প্রতিটি পর্বে পাশাপাশি আছে একাধিক সমধর্মী বা সমবিষয়-কেন্দ্রিক রচনা। এই সজ্জার ধরনটি শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। 'হাতে-কলমে' বিভাগে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তা-নির্ভর শিখনের সম্ভার। সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাবর্ষে নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী একটি আলাদা দ্রুতপঠন পুস্তক হিসেবে সংযোজিত হলো প্রখ্যাত লেখিকা লীলা মজুমদারের উপন্যাস 'মাকু'। সেই বইটিতেও রয়েছে কল্পনার রঙিন পরিসর। উপরন্তু, আমরা চেয়েছি উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী একটি গোটা বই পড়ার সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতার দিকে যেন এগোতে পারে। এই দুটি পুস্তকই ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় রাজ্যের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

সপ্তম শ্রেণির 'সাহিত্যমেলা' বইটিকে রঙে-রেখায় অপূর্ব সৌন্দর্যে অলংকৃত করে দিয়েছেন বরেণ্য শিল্পী শ্রী শুভাপ্রসন্ন। তাঁকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটির শেষে 'শিখন পরামর্শ' সংযোজিত হলো। আমাদের বিশ্বাস এই অংশটি শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেবে। আশা করি, বইগুলি রাজ্যের শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামগ্রী হিসেবে গৃহীত হবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

ডিসেম্বর, ২০১৭
বিকাশ ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় সুদক্ষিণা ঘোষ

রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু

পরামর্শ ও সহযোগিতা

শুভময় সরকার রূপা বিশ্বাস শ্রীময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরঞ্জীব সরকার মীনাক্ষী চৌধুরী মণিকণা মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

শুভাপ্রসন্ন

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমি

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা

জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

সূচিপত্র

প্রথম পাঠ

পৃষ্ঠা

১

ছন্দে শুধু

কান রাখো

অজিত দত্ত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাগলা গণেশ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পাঠ

পৃষ্ঠা

১২

বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মাতৃভাষা

কেদারনাথ সিং

একুশের কবিতা

আশরাফ সিদ্দিকী

একুশের তাৎপর্য

আবুল ফজল

নানান দেশে নানান ভাষা

রামনিধি গুপ্ত

তৃতীয় পাঠ

পৃষ্ঠা

২৩

আত্মকথা

রামকিঙ্কর বেইজ

আঁকা, লেখা

মৃদুল দাশগুপ্ত

খোকনের প্রথম ছবি

বনফুল

কুতুব মিনারের কথা

সৈয়দ মুজতবা আলি

আজি দখিন দুয়ার খোলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চতুর্থ পাঠ

পৃষ্ঠা	কার দৌড় কদ্দুর	নোট বই	মেঘ-চোর
৪২	শিবতোষ মুখোপাধ্যায়	সুকুমার রায়	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চম পাঠ

পৃষ্ঠা	দুটি গানের জন্মকথা	কাজী নজরুলের গান	আছেন কোথায় স্বর্গপুরে
৬৩		রামকুমার চট্টোপাধ্যায়	লালন ফকির

ষষ্ঠ পাঠ

পৃষ্ঠা	স্মৃতিচিহ্ন	চিরদিনের	জাতের বজ্জাতি
৭০	কামিনী রায়	সুকান্ত ভট্টাচার্য	কাজী নজরুল ইসলাম

তুমি নির্মল করো মঙ্গল-করে রজনীকান্ত সেন

সপ্তম পাঠ

পৃষ্ঠা	ভানুসিংহের পত্রাবলি	নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়
৮০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অষ্টম পাঠ

পৃষ্ঠা ৮৫

ভারততীর্থ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী
কমলা দাশগুপ্ত

নবম পাঠ

পৃষ্ঠা ৯৫

রাস্তায় ক্রিকেট খেলা
মাইকেল অ্যানটনি

দিন ফুরোলে
শঙ্খ ঘোষ

জাদুকাহিনি
অজিত কৃষ্ণ বসু

গাধার কান
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাটিয়ালি গান
ও আমার দরদী আগে জানলে

দশম পাঠ

পৃষ্ঠা ১১৯

পটলবাবু ফিল্মস্টার
সত্যজিৎ রায়

চিন্তাশীল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একাদশ পাঠ

পৃষ্ঠা ১৩৯

দেবতাত্মা হিমালয়
প্রবোধকুমার সান্যাল

বই-টই
প্রেমেন্দ্র মিত্র

বই পড়ার কায়দা কানুন

শিখন পরামর্শ

পৃষ্ঠা ১৫০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শুভাপ্রসন্ন

ছন্দে শুধু কান রাখো

অজিত দত্ত

মন্দ কথায় মন দিয়ো না
ছন্দে শুধু কান রাখো,
দ্বন্দ্ব ভুলে মন না দিলে
ছন্দ শোনা যায় নাকো।
ছন্দ আছে ঝড়-বাদলে
ছন্দ আছে জোছনাতে,
দিন দুপুরে পাখির ডাকে
ঝিঁঝির ডাকে ঘোর রাতে।
নদীর স্রোতের ছন্দ যদি
মনের মাঝে শুনতে পাও
দেখবে তখন তেমন ছড়া
কেউ লেখেনি আর কোথাও।
ছন্দ বাজে মোটর চাকায়
ছন্দে চলে রেলগাড়ি
জলের ছন্দে তাল মিলিয়ে
নৌকো জাহাজ দেয় পাড়ি।
ছন্দে চলে ঘড়ির কাঁটা
ছন্দে বাঁধা রাত্রি-দিন,
কান পেতে যা শুনতে পাবে
কিচ্ছুটি নয় ছন্দহীন।
সকল ছন্দ শুনবে যারা
কান পেতে আর মন পেতে
চিনবে তারা ভুবনটাকে
ছন্দ সুরের সংকেতে।
মনের মাঝে জমবে মজা
জীবন হবে পদ্যময়,
কান না দিলে ছন্দে জেনো
পদ্য লেখা সহজ নয়।

১. **অনধিক দুটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

১.১ " মন্দ কথায় কান দিয়ো না "— মন্দ কথার প্রতি কবির কীরূপ মনোভাব কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে?

১.২ " কেউ লেখেনি আর কোথাও "— কোন লেখার কথা এখানে বলা হয়েছে?

১.৩ " চিনবে তারা ভুবনটাকে "— কারা কীভাবে ভুবনটাকে চিনবে?

১.৪ " পদ্য লেখা সহজ নয় "— পদ্য লেখা কখন সহজ হবে বলে কবি মনে করেন?

১.৫ " ছন্দ শোনা যায় নাকো " — কখন কবির ভাবনায় আর ছন্দ শোনা যায় না?

২. **বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্তন করো এবং বাক্য রচনা করো :**

ঝড়, মন, ছন্দ, দিন, সুর, সংকেত, দ্বন্দ্ব, মন্দ, ছন্দহীন, পদ্যময়, সহজ,

যেমন— ঝড় (বি.) > ঝোড়ো (বিণ.) > আজ সকাল থেকেই ঝোড়ো হাওয়া বইছে।

৩. **নীচের শব্দগুলিকে আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহার করে দুটি করে বাক্য লেখো :**

মন্দ, দ্বন্দ্ব, তাল, ডাক, বাজে, ছড়া, মজা, নয়।

শব্দার্থ : দ্বন্দ্ব— সংঘাত, ঝগড়া, বিবাদ। ভুবন— পৃথিবী, জগৎ। সঙ্কেত—ইশারা, ইঙ্গিত।

৪. **নীচের শব্দগুলি কোন মূল শব্দ থেকে এসেছে লেখো :**

জোছনা, চাকা, কান, দুপুর, ঝিঁঝি।

৫. **কবিতার ভাষা থেকে মৌখিক ভাষায় রূপান্তরিত করো :**

৫.১ ছন্দ আছে ঝড়-বাদলে

৫.২ ছন্দে বাঁধা রাত্রি দিন

৫.৩ কিচ্ছুটি নয় ছন্দহীন

৫.৪ চিনবে তারা ভুবনটাকে/ছন্দ সুরের সংকেতে

৫.৫ কান না দিলে ছন্দে জেনো/পদ্য লেখা সহজ নয়

৬. **'কান' শব্দটিকে পাঁচটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে বাক্য লেখো :**

অজিত দত্ত (১৯০৭ - ১৯৭৯) : জন্ম ঢাকার বিক্রমপুরে। ত্রিশ-চল্লিশ দশকের আধুনিক বাংলা কবিতার একজন বিশিষ্ট কবি। বন্ধু বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তরুণ বয়সেই সম্পাদনা করেন 'প্রগতি' পত্রিকা। 'কল্লোল' সাহিত্য গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক অজিত দত্ত 'কবিতা' পত্রিকার সূচনা থেকেই ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমের মাস', 'পাতালকন্যা', 'নষ্টচাঁদ', 'পুনর্নবা', 'ছড়ার বই', 'ছায়ার আলপনা' প্রভৃতি।

৭. 'ঝড়-বাদল'— এমনই সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক শব্দ দিয়ে তৈরি পাঁচটি শব্দ লেখো :

৮. তোমার পরিচিত আর কোন কোন যানবাহনের চলার মধ্যে নির্দিষ্ট ছন্দ রয়েছে?

৯. নানা প্রাকৃতিক ঘটনায় কীভাবে প্রকৃতির ছন্দ ধরা পড়ে?

কান পেতে শোনা যাবে এমন	মন পেতে শোনা যাবে এমন

● সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পালকির গান' কবিতাটি শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে সংগ্রহ করো।

১০. সমার্থক শব্দ লেখো :

জল, দিন, রাত্রি, নদী, ভুবন

১১. শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য দেখাও :

দিন	মন	সুর	সকল
দীন	মণ	শূর	শকল

১২. 'যারা-তারা' র মতো তিনটি সাপেক্ষ শব্দজোড় তৈরি করো।

১৩. কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে তিনটি সর্বনাম লেখো।

১৪. কবিতায় রয়েছে এমন চারটি 'সম্বন্ধ পদ' উল্লেখ করো।

১৫. নীচের বাক্য/ বাক্যাংশের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ আলাদাভাবে দেখাও :

১৫.১ ছন্দ আছে ঝড়-বাদলে

১৫.২ দেখবে তখন তেমন ছড়া / কেউ লেখেনি আর কোথাও।

১৫.৩ জলের ছন্দে তাল মিলিয়ে / নৌকো জাহাজ দেয় পাড়ি।

১৫.৪ চিনবে তারা ভুবনটাকে / ছন্দ সুরের সংকেতে।

১৬. নিম্নরেখ অংশগুলির কারক-বিভক্তি নির্দেশ করো :

১৬.১ ছন্দে শুধু কান রাখো।

১৬.২ ছন্দ আছে ঝড়-বাদলে।

১৬.৩ দিন দুপুরে পাখির ডাকে।

১৬.৪ ছন্দে চলে রেলগাড়ি।

১৬.৫ চিনবে তারা ভুবনটাকে।

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ॥
হাসি কান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা একটি স্কেচ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বাংলাভাষার অগ্রগণ্য গীতিকার এবং সুরকার। তাঁর রচিত গানগুলি 'গীতিবতান' নামের বইতে কয়েক খণ্ডে বিধৃত রয়েছে। আর গানগুলির স্বরলিপি বিভিন্ন খণ্ডে রয়েছে 'স্বরবিতান' নামের বইয়ে। এই গানটি 'বিচিত্র' পর্যায়ের অন্তর্গত।

পাগলা গণেশ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধকারী মলম আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে পৃথিবীতে নানারকম উড়ান যন্ত্র আবিষ্কারের একটা খুব হিড়িক পড়ে গেছে। কেউ ডাইনিদের বাহন ডান্ডাওলা ঝাঁটার মতো, কেউ নারদের ঢেঁকির মতো, কেউ কার্পেটের মতো, কেউ কার্তিকের বাহন ময়ূরের মতো উড়ান যন্ত্র আবিষ্কার করে তাতে চড়ে বিষয়কর্মে যাতায়াত করছে।

আকাশে তাই সবসময়েই নানারকম জিনিস উড়তে দেখা যায়।

এমন কি কৃত্রিম পাখনাওলা মানুষকেও।

সালটা ৩৫৮৯। ইতিমধ্যে চাঁদ,মঙ্গল এবং শুক্রগ্রহে মানুষ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে, সূর্যের আরও দুটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং জানা গেছে আর কোনো গ্রহ নেই। মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে হাজার হাজার মানুষ আলোর চেয়েও গতিবেগসম্পন্ন মহাকাশযানে রওনা হয়ে গেছে এক-দেড়শো বছর আগে থেকে এবং এখনও অনেকে যাচ্ছে। কাছেপিঠে যারা গেছে তাদের ফেরার সময় হয়ে এল। তবে সেটা এক মিনিট পর না একশো বছর পর, তা জানবার উপায় নেই।

তা বলে পৃথিবীর মানুষেরা হাল ছাড়েনি। সেই এক দেড়শো বছর আগে যারা জন্মেছিল তারা সকলেই সশরীরে বর্তমান। আজকাল পৃথিবীতে মানুষ মরে না। যারা মহাকাশে গেছে তারা ফিরে এসে সেই আমলের লোকেদের দেখতে পাবে। তবে সব মানুষই বেঁচে আছে বলে নতুন মানুষের জন্মও আর হচ্ছে না। গত দেড়শো বছরের মধ্যে কেউ পৃথিবীতে শিশুর কান্না শোনেনি।

এদিকে ঘরে ঘরে মানুষ এত বেশি বিজ্ঞান নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে যে, প্রতিঘরের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিজ্ঞানের বিজ্ঞানী।

বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো চর্চাই নেই। কবিতা, গান, ছবি আঁকা, কথাসাহিত্য, নাটক, সিনেমা এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ওসব অনাবশ্যক ভাবাবেগ কোনো কাজেই লাগে না।

খামোখা সময় নষ্ট।

খেলাধুলোর পাটও চুকে গেছে।

অলিম্পিক উঠে গেছে। বিশ্বকাপ বিলুপ্ত। আছে শুধু বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান।

পূর্ণিমার চাঁদ দেখলে, কোকিলের ডাক শুনলে বা পলাশ ফুল ফুটলে কেউ আর আহা উহু করে না। বর্ষাকালের বৃষ্টি দেখলে কারও মন আর মেদুর হয় না! ওগুলোকে প্রাকৃতিক কার্যকারণ হিসেবেই দেখা হয়!

গোলাপ ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে তার অ্যানালাইসিসটাই বেশি জরুরি। দয়া মায়া করুণা ভালোবাসা ইত্যাদিরও প্রয়োজন না থাকায় এবং চর্চার অভাবে মানুষের মনে আর ওসবের উদ্রেক হয় না।

ব্যতিক্রম অবশ্য এক আধজন আছে।

যেমন পাগলা গণেশ। পাগলা গণেশের বয়স দুশো বছর।

তার পঞ্চাশ বছর বয়সে, অর্থাৎ আজ থেকে দেড়শো বছর আগে মৃত্যুঞ্জয় টনিক আবিষ্কার হয়। গণেশও আর সকলের মতো টনিকটা খেয়েছিল। ফলে তার মৃত্যু বন্ধ হয়ে গেল। দেড়শো বছর আগে যখন সুকুমার শিল্পবিরোধী আন্দোলন শুরু হলো এবং শিল্প সংগীত সাহিত্য ইত্যাদির পাট উঠে যেতে লাগল, তখন গণেশের ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। তাছাড়া বিজ্ঞানের বাড়াবাড়িরও একটা সীমা থাকা দরকার বলে তার মনে হলো।

গণেশ অনেক চেষ্টা করে যখন দেখল কালের চাকার গতি উল্টোদিকে ফেরানো যাবে না, তখন সে সভ্য সমাজ থেকে দূরে থাকার জন্য হিমালয়ের একটা গিরিগুহায় আশ্রয় নিল।

তা বলে হিমালয় যে খুব নির্জন জায়গা তা নয়। এভারেস্টের চূড়া চেঁছে অবজার্ভেটরি হয়েছে, রূপকুণ্ডে বায়োকেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরি, কে টু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, যমুনেত্রী, গঙ্গোত্রী, মানস সরোবর সর্বত্রই নানা ধরনের গবেষণাগার। সমুদ্রের তলাতেও চলছে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অর্থাৎ ভূগর্ভে, ভূপৃষ্ঠে এবং অন্তরীক্ষে কোথাও নিপাট নির্জনতা নেই। পৃথিবীর জনসংখ্যা যে খুব বেশি তা নয়। কিন্তু তারা সমস্ত পৃথিবীতে এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে, নির্জনতা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কাজ।

এই তো আজ সকাল থেকে গণেশ বসে কবিতা লিখেছে। একটু আগে একটা ঢেঁকি আর একটা ভেলায় চড়ে দুটো লোক এসে বলল, এই যে গণেশবাবু, কী করছেন?

কবিতা লিখছি।

কবিতা? হোঃ হোঃ হোঃ ! তা আপনার কবিতা শুনছেই বা কে আর পড়ছেই বা কে?

আকাশ শুনছে, বাতাস শুনছে, প্রকৃতি শুনছে। কবিতার পাতা বাতাসে ভাসিয়ে দিচ্ছি। যদি কেউ কুড়িয়ে পায় আর পড়তে ইচ্ছে হয় তো পড়বে।

হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ !

ক দিন আগে সন্ধেবেলা গণেশ একদিন গলা ছেড়ে গান গাইছিল। তার গানের গলা বেশ ভালোই।

হঠাৎ দুটো পাখাওলা লোক লাসা থেকে ইসলামাবাদ যেতে যেতে নেমে এসে রীতিমতো ধমক দিয়ে বলল, ও মশাই, অমন বিকট শব্দ করছেন কেন?

শব্দ কী ! এ যে গান!

গান! ওকেই কি গান বলে নাকি! ধুর মশাই, এ যে বিটকেল শব্দ!

একদিন পাহাড়ের গায়ে যান্ত্রিক বাটালি দিয়ে পাথর কেটে ছবি আঁকছিল গণেশ। হঠাৎ একটা ধামা নেমে এল। এক মহিলা খুব আগ্রহের সঙ্গে বলে চলেন, এটা কীসের সার্কিট ডিজাইন বলুন তো! বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে!

ডিজাইন নয়, ছবি। খেয়ালখুশির ছবি।

ভদ্রমহিলা চোখের পলক না ফেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই! ছবি হচ্ছে! হুঁঃ!

গণেশ জানে, একা সে পৃথিবীর গতি কিছুতেই উল্টে দিতে পারবে না। কিন্তু একা বসে বসে যে নিজের মনের মতো কিছু করবে তারও উপায় নেই। এই মৃত্যুহীন জীবন, এই অন্তহীন আয়ু কি এভাবেই যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে হবে? সুইসাইড করেও কোনো লাভ নেই। আজকাল মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা শক্ত কাজ তো নয়ই, বরং পৃথিবীর জনসংখ্যার ভারসাম্য রাখতে তা করা আবশ্যিক।

গণেশের তিন ছেলে, এক মেয়ে। বড়ো ছেলের বয়স একশো চুয়াত্তর বছর, মেজোর একশো একাত্তর, ছোটো ছেলের একশো আটষট্টি এবং মেয়ের বয়স একশো ছেষট্টি। প্রত্যেকেই কৃতী বিজ্ঞানী। তারা অবশ্য বাপের কাছে আসে না। অন্তত গত একশো বছরের মধ্যে নয়। গণেশ তাদের মুখশ্রী ভুলে গেছে। গণেশের স্ত্রী ক্যালিফোর্নিয়া মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করতেন, দেড়শো বছর আগে তিনি অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জে

রওনা হয়ে যান। এখনও ফেরেননি।

আজ সকালে গণেশকে কবিতায় পেয়েছে। কবিতা লিখছে আর ভাসিয়ে দিচ্ছে বাতাসে। কবিতার কাগজগুলো বাতাসে কাটা ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছে, ঘুরছে ফিরছে, ভাসছে, পাক খাচ্ছে, তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে অনেক দূর। প্রতিদিন যত কবিতা লিখেছে গণেশ, সবই এইভাবে ভাসিয়ে দিয়েছে। যদি কারও কাছে পৌঁছোয়, যদি কেউ পড়ে।

আকাশে একটা পিপে ভাসছিল। গণেশ লক্ষ করেনি। পিপেটা ধীরে ধীরে নেমে এল। নামল একজন পুলিশম্যান। গণেশকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বলল, স্যার, এককালে আপনি যখন কলকাতার সায়েন্স কলেজে মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স পড়াতেন, তখন আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। কিন্তু এসব আপনি কী করছেন? পাহাড়ময় কাগজ ছড়াচ্ছেন কেন? এটা কি নতুন ধরনের কোনো গবেষণা?

গণেশ মাথা নাড়ল, না হে না, ওসব গবেষণা টবেষণা আমি ভুলে গেছি। আমি পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।

তার মানে? পৃথিবী তো দিব্যি বেঁচে আছে। মরার কোনো লক্ষণই নেই।

মরছে। পৃথিবী মরছে। পরে টের পাবে।

এ কাগজগুলো কি কোনো প্রেসক্রিপশন? পৃথিবীর বাঁচবার ওষুধ?

ঠিক তাই। ওগুলো কবিতা। তুমি পড়ে দেখতে পারো।

লোকটা মাথার হেলমেট খুলে মাথা চুলকে হতভম্বের মতো বলল, কবিতা!

হ্যাঁ। কবিতা পড়ো?

লোকটা পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা পাক-খাওয়া কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

কিছু বুঝলে?

লোকটা অসহায় ভাবে মাথা নেড়ে বলল, কিছু বুঝতে পারছি না স্যার। কোনোদিন এ জিনিস পড়িনি।

তোমার বয়স কত?

একশো একান্ন বছর।

বাচ্চা ছেলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আমাদের আমলে শিক্ষানিকেতনে এসব পড়ানো হতো না। শুনেছি তারও অনেক আগে কবিতা নামে কী যেন ছিল।

লোকটি নিরীহ এবং ভালোমানুষ দেখে গণেশবাবু হুকুমের সুরে বলে উঠল, মনে মনে পড়লে হবে না। জোরে জোরে পড়ো।

লোকটি কাগজটার দিকে চেয়ে থেমে থেমে পড়তে লাগল, গ্রহটি সবুজ ছিল, গাঢ় নীল জল, ফিরোজা আকাশ... কোকিলের ডাক ছিল, প্রজাপতি, ফুলের সুবাস... আধো আধো বোল ছিল, টলে টলে হাঁটা ছিল, শিশু ভোলানাথ—শৈশব ভাসায়ে জলে, কবি যে বৃহৎ হলে, নামিল আঘাত।—

থামো, বুঝলে কিছু?

লোকটি মাথা নেড়ে বলে, কিছুই বুঝিনি স্যার।

একটুও না?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, শুধু মনে পড়ছে একসময়ে আমিও টলে টলে হাঁটতে শিখেছিলুম—

গণেশ হতাশ হলো। কবিতা তার ভালো হয়নি ঠিকই, কিন্তু না বুঝবার মতো নয়।

লোকটা গণেশকে অভিবাদন করে চলে গেল, যেন একটু ভয়ে ভয়েই।

পরদিন সকালে রোজকার মতো কবিতা লিখতে বসেছে গণেশ। এমন সময় একটা বড়ো সড়ো পিপে এসে সামনে নামল।

স্যার!

গণেশ তাকিয়ে দেখে, সেই লোকটি, সঙ্গে দুই মহিলা।

আমার স্ত্রী আর মাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমার মা কবিতার ব্যাপারটা খানিকটা জানে। এরা দুজনেই কবিতা শুনতে চায়।

গণেশ অবাক এবং খুশি দুই-ই হলো। তবে কবিতা শুনিয়েই ছাড়ল না। গান শোনালো, ছবি দেখালো।

তিনজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে রইল।

কিছু বুঝতে পারছো তোমরা?

তিনজনেই মাথা নেড়ে জানাল, না।

লোকটা বিনীত ভাবেই বলল, না বুঝলেও আমার মধ্যে কী যেন একটা হচ্ছে।

কী হচ্ছে?

ঠিক বোঝাতে পারব না।

পরদিন লোকটা ফের এল। সঙ্গে আরও চারজন পুলিশম্যান।

এরা স্যার আমার সহকর্মী, কবিতা গান ছবির ব্যাপারটা বুঝতে চায়।

গণেশ খুব খুশি। বোসো বোসো।

পাঁচজন শ্রোতা ও দর্শক ঘণ্টা দুই ধরে গণেশের কবিতা শুনল, গান শুনল, ছবি দেখল। কেউ ঠাট্টা বিদ্রুপ করল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

পরদিন লোকটা এল না। কিন্তু জনা দশেক লোক এল। পুলিশ আছে, বৈজ্ঞানিক আছে, টেকনিশিয়ান আছে।

পরদিন আরও কিছু লোক বাড়ল।

পরদিন আরও।

আরও।

এক সপ্তাহ পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব তাঁর বিমান থেকে নামলেন গণেশের ডেরায়। এ আপনি কী কাণ্ড করেছেন? পৃথিবী যে উচ্ছন্নে গেল! লোকে গান গাইতে লেগেছে, কবিতা মকসো করছে, হিজিবিজি ছবি আঁকছে।

গণেশ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বলল, যাঃ তাহলে আর ভয় নেই। দুনিয়াটা বেঁচে যাবে...

১. **সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :**

১.১ 'পাগলা গণেশ' একটি (বিজ্ঞান/ কল্পবিজ্ঞান/ রূপকথা) - বিষয়ক গল্প।

১.২ 'অবজার্ভেটরি'– র বাংলা প্রতিশব্দ (পরীক্ষাগার/ গবেষণাগার/ নিরীক্ষণাগার)।

১.৩ সভ্যসমাজ থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে গণেশ (হিমালয়ের গিরিগুহায়/ গভীর জঙ্গলে/ মহাকাশে) আশ্রয় নিয়েছিলেন।

১.৪ গল্পের তথ্য অনুসারে মৃত্যুঞ্জয় টনিক আবিষ্কার হয়েছিল (৩৫৮৯/ ৩৪৩৯/ ৩৫০০) সালে।

২. **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

২.১ ''সালটা ৩৫৮৯''— এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে কোন্ কোন্ নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা গল্পে বলা হয়েছে?

২.২ ''ওসব অনাবশ্যক ভাবাবেগ কোনো কাজেই লাগে না''---'অনাবশ্যক ভাবাবেগ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? তাকে সত্যিই তোমার 'অনাবশ্যক' বলে মনে হয় কি?

২.৩ ''চর্চার অভাবে মানুষের মনে আর ওসবের উদ্রেক হয় না''— মানুষের মন থেকে কোন কোন অনুভূতিগুলো হারিয়ে গেছে?

২.৪ ''ব্যতিক্রম অবশ্য এক আধজন আছে''— ব্যতিক্রমী মানুষটি কে? কীভাবে তিনি 'ব্যতিক্রম' হয়ে উঠেছিলেন?

২.৫ '' ও মশাই, এমন বিকট শব্দ করছেন কেন?''— কার উদ্দেশ্যে কারা একথা বলেছিল? কোন কাজকে তারা 'বিকট শব্দ' মনে করেছিল?

২.৬ '' গণেশ তাদের মুখশ্রী ভুলে গেছে''— গণেশ কাদের মুখশ্রী ভুলে গেছে? তাঁর এই ভুলে যাওয়ার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

২.৭ ''গণেশকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বলল''— কে, কী বলেছিল? তার এভাবে তাঁকে সম্মান জানানোর কারণটি কী?

২.৮ '' আমি পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি''— বক্তা কীভাবে পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল? তার প্রয়াস শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল কি?

২.৯ ''লোকটা অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বলল'' — এখানে কার কথা বলা হয়েছে? সে কী বলল? তার অসহায়ভাবে মাথা নাড়ার কারণ কী?

২.১০ ''তিনজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে রইল''— এই তিনজন কারা? তাদের মুগ্ধতার কারণ কী?

৩. 'পাগলা গণেশ' গল্পের মুখ্য চরিত্র গণেশকে তোমার কেমন লাগল?

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫) : জন্ম ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে ময়মনসিংহে। পিতার রেলে চাকরির সূত্রে আশৈশব যাযাবর জীবন দেশের নানা স্থানে। স্কুলশিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের সূচনা, পরে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা', প্রথম কিশোর উপন্যাস 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন ১৯৮৫ সালের 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার'। এছাড়াও পেয়েছেন 'আনন্দ পুরস্কার', 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার। সব ধরনের খেলায় — বক্সিং, টেনিস, ক্রিকেট, ফুটবল, টি.টি., অ্যাথলেটিকস-এ তাঁর উৎসাহ অদম্য। পাঠক হিসেবেও সর্বগ্রাসী। ভালোবাসেন থ্রিলার, কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি।

৪. **অর্থ অপরিবর্তিত রেখে নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দগুলির পরিবর্তে নতুন শব্দ বসাও :**

৪.১ ওসব অনাবশ্যক ভাবাবেগ কোনো কাজেই লাগে না।
৪.২ কেউ ঠাট্টা বিদ্রুপ করল না।
৪.৩ দুনিয়াটা বেঁচে যাবে।
৪.৪ মহাসচিব তাঁর বিমান থেকে নামলেন গণেশের ডেরায়।
৪.৫ গণেশকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানিয়ে বলল।
৪.৬ লোকে গান গাইতে লেগেছে, কবিতা মকসো করছে।
৪.৭ হিমালয় যে খুব নির্জন জায়গা, তা নয়।
৪.৮ ধুর মশাই, এ যে বিটকেল শব্দ।

৫. **এককথায় লেখো :**

মহান যে সচিব, প্রতিরোধ করে যে, গতিবেগ আছে যার, মৃত্যুকে জয় করেছে যে, অন্ত নেই যার।

শব্দার্থ : প্রতিরোধকারী— প্রতিরোধ করেছে বা বাধা দিয়েছে এমন। উড়ান যন্ত্র— যাতে চড়ে উড়ে বেড়ানো যায় এমন যন্ত্র। সশরীরে— শরীর সহ বা শরীর নিয়ে। অনাবশ্যক — যার দরকার নেই। ভাবাবেগ— আবেগ বা অনুভূতির আধিক্য, বিহ্বলতা। খামোখা—অকারণে, অনর্থক। বিলুপ্ত — সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে এমন। মেদুর—স্নিগ্ধ ও কোমল। উদ্রেক— সঞ্চার, উদয়। মৃত্যুঞ্জয়—মরণকে জয় করেছে এমন। অবজার্ভেটরি— মানমন্দির। গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি পর্যবেক্ষণের গবেষণাগার। ল্যাবরেটরি/গবেষণাগার— (বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে) যেখানে গবেষণা করা হয়। অন্তরীক্ষ — আকাশ। নিপাট—একেবারে, নিতান্ত, নিছক। অন্তহীন— শেষ নেই যার। আয়ু— জীবনকাল। কৃতী— সফল, সার্থক। সসম্ভ্রমে—সম্মান / মর্যাদা সহ। অভিবাদন — নমস্কার বা কোনোভাবে সম্মান প্রদর্শন (দেখানো/জানানো)। নিরীহ— নির্বিরোধ, কারো ক্ষতি করে না এমন। মন্ত্রমুগ্ধ— মন্ত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত। উচ্ছন্নে যাওয়া— অধঃপাতে যাওয়া। মকসো—অভ্যাস।

৬. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :**

মাধ্যাকর্ষণ, আবিষ্কার, মৃত্যুঞ্জয়, অনাবশ্যক, গবেষণা, অন্তরীক্ষ, গণেশ, হিমালয়, নির্জন গবেষণাগার, পরীক্ষা।

৭. **সমার্থক শব্দ লেখো :**

কৃত্রিম, পৃথিবী, আন্দোলন।

৮. **নিম্নলিখিত বিশেষণগুলির পর উপযুক্ত বিশেষ্য বসাও এবং বাক্যরচনা করো :**

কৃত্রিম, মেদুর, সুকুমার, যান্ত্রিক, ফিরোজা, মন্ত্রমুগ্ধ।

৯. **রেখাঙ্কিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো :**

৯.১ গণেশও আর সকলের মতো টনিকটা খেয়েছিল।
৯.২ তার গানের গলা বেশ ভালোই।
৯.৩ আকাশে একটা পিপে ভাসছিল।
৯.৪ আজ সকালে গণেশকে কবিতায় পেয়েছে।
৯.৫ আমি পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।
৯.৬ ও মশাই, অমন বিকট শব্দ করছেন কেন?
৯.৭ রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব তাঁর বিমান থেকে নামলেন।
৯.৮ তিনজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে রইল।

বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

"My Native Land, Good night!" : Byron

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন কোরো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন;—
কিন্তু কোন গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো,শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া করো,
ভুল দোষ, গুণ ধরো,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!

১. **ঠিক উত্তরটি খুঁজে নিয়ে লেখো :**

১.১ 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় যে শীর্ষ উল্লেখটি আছে, সেটি কবি বায়রন- এর রচনা। তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো _____ ।

১.২ লালবর্ণের পদ্ম 'কোকনদ'। সেরকম নীল রঙের পদ্মকে _____ ও সাদা রঙের পদ্মকে _____ বলা হয়।

২. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

২.১ 'এ মিনতি করি পদে'— কবি কার কাছে কী প্রার্থনা জানিয়েছেন?

২.২ 'সেই ধন্য নরকুলে'— কোন মানুষ নরকুলে ধন্য হন?

৩. **গদ্যরূপ লেখো :**

পরমাদ, যাচিব, কহ, যথা, জন্মিলে, দেহ, হেন, সাধিতে

শব্দার্থ : মিনতি— অনুনয়, বিনীত অনুরোধ, আবেদন। পরমাদ —'প্রমাদ'-এর পরিবর্তিত (কোমল) রূপ। ভুল—বিস্মৃতি, অনবধানতা। কোকনদ—লাল পদ্ম। প্রবাস— বিদেশ। দৈব —অদৃষ্ট, ভাগ্য। নীর —জল। শমন— মৃত্যুর দেবতা যম। মক্ষিকা—মাছি। অমৃত—যা পান করলে মৃত্যু হয় না, সুধা। অমৃত হ্রদ--- সুধায় পূর্ণ হ্রদ। জন্মদে---'জন্মদা'-র সম্বোধন রূপ, জন্ম দেয় যে,জননী। সুবরদে—'সুবরদা'-র সম্বোধন রূপ, সু (শুভ) বর দেন যিনি, বরদাত্রী। মধুময়—মধুতে ভরা, মধুমাখা। তামরস— পদ্ম।

৪. **শূন্যস্থানে উপযুক্ত বিশেষণ বসাও :**

..... মন্দির, ...হ্রদ, ...তামরস।

৫. **স্থূলাক্ষর অংশগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :**

৫.১ রেখো, **মা**, দাসেরে মনে।

৫.২ এ **দেহ-আকাশ** হতে।

৫.৩ **মধুহীন** কোরো না গো তব মনঃকোকনদে।

৫.৪ মনের **মন্দিরে** সদা সেবে সর্বজন।

৫.৫ মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে **অমৃত-হ্রদে**!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) : জন্ম অধুনা বাংলাদেশের যশোহরে, সাগরদাঁড়ি গ্রামে। পিতা প্রখ্যাত আইনজীবী রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহ্নবী দেবী। বাংলা কাব্যে নতুন যুগ আসে তাঁর কলমে, নাটকেও জাগে নতুন ধারা। হিন্দু কলেজের উজ্জ্বলতম এই ছাত্রটি বিলেতে গিয়ে বড়ো কবি হওয়ার স্বপ্ন সফল করতে ধর্মান্তরিত হন ১৮৪৩ সালে। তখন থেকে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয় 'মাইকেল' শব্দটি। ইংরেজি ভাষায় 'The Captive Ladie' এবং 'Visions of the Past' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করলেও তিনি স্মরণীয় 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'চতুর্দশপদী কবিতা'-র রচয়িতা হিসেবে। 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি নাটক ও 'একেই কি বলে সভ্যতা?' আর 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের স্রষ্টা তিনিই। বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারও তাঁরই দান।

৬. **পদ পরিবর্তন করে বাক্য রচনা করো :**

মধু, প্রকাশ, দেহ, অমর, দোষ, বসন্ত, দৈব।

৭. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

প্রবাস, অমর, স্থির, জীবন, অমৃত।

৮. 'পরমাদ' শব্দটি কোন মূল শব্দ থেকে এসেছে?

৯. কবির নিজেকে বঙ্গভূমির দাস বলার মধ্যে দিয়ে তাঁর কোন মনোভাবের পরিচয় মেলে?

১০. 'মধুহীন কোরো না গো'—'মধু' শব্দটি কোন দুটি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে?

১১. কবিতা থেকে পাঁচটি উপমা বা তুলনাবাচক শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো।

১২. 'মন্দির' শব্দটির আদি ও প্রচলিত অর্থ দুটি লেখো।

১৩. কবিতাটিতে কোন কোন ঋতুর উল্লেখ রয়েছে?

১৪. 'মানস' শব্দটি কবিতায় কোন কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

১৫. কবির দৃষ্টিতে নশ্বর মানুষ কীভাবে অমরতা লাভ করতে পারে তা লেখো।

মাতৃভাষা

কেদারনাথ সিং

পিঁপড়ে যেভাবে ফেরে
নিজের গর্তে
কাঠঠোকরা পাখি
কাঠে ফেরে
বায়ুযান একে একে ফিরে আসে
লাল আকাশে ডানা মেলে
বিমানবন্দরে

ও আমার ভাষা
আমি তোমারই ভিতরে ফিরি
চুপ করে থাকতে থাকতে যখন
আমার জিভ অসাড় হয়ে যায়
আমার আত্মা দুঃখ হয়ে ওঠে।

কেদারনাথ সিং (১৯৩৪) : হিন্দি ভাষার প্রখ্যাত কবি। ১৯৮৯ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। 'আকালের মধ্যে সারস' ('আকাল মে সারস') গ্রন্থের জন্য। গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, পরে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সহজ, দৈনন্দিন ভাষায় কবিতা লেখেন যার মূলে থাকে জটিল জীবনসমস্যার প্রতিফলন।

বিখ্যাত কাব্যসংকলন— 'আভি বিলকুল আভি', 'জমিন পাক রহী হ্যায়' ইত্যাদি। তিনি গল্প এবং প্রবন্ধ রচয়িতাও বটে।

তরজমা—মল্লিকা সেনগুপ্ত

একুশের কবিতা

আশরাফ সিদ্দিকী

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥

কবেকার পাঠশালায় পড়া মন্ত্রের মতো সেই সুর
সুর নয় স্মৃতির মধুভাণ্ডার...
সেই আমার দেশ-মাঠ-বন-নদী—

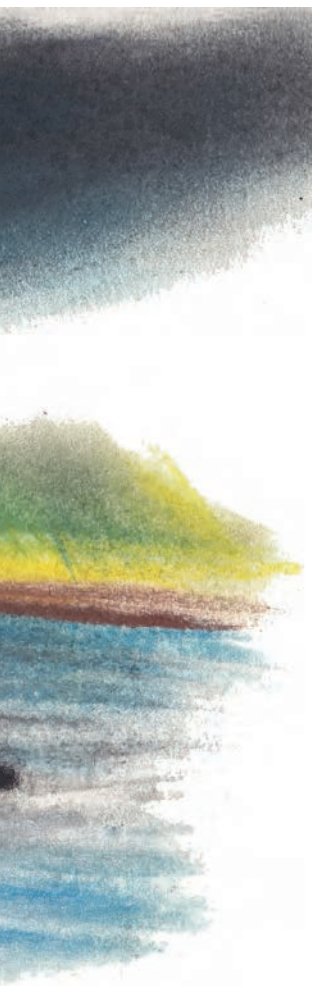

আমার দেশের জারি সারি ভাটিয়ালি মুর্শিদি
আরও কত সুরের সাথে মিশে আছে
আমার মায়ের মুখ
আমার মায়ের গাওয়া কত না গানের কলি!
বিন্নিধানের মাঠের ধারে হঠাৎ কয়েকটি গুলির আওয়াজ...
কয়েকটি পাখির গান শেষ না হতেই তারা ঝরে গেলো
পড়ে গেল মাটিতে
সেই শোকে কালবৈশাখীর ঝড় উঠলো আকাশে
মাঠ কাঁপলো
ঘাট কাঁপলো
বাট কাঁপলো
হাট কাঁপলো
বন কাঁপলো
মন কাঁপলো
ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়ে লিখে নিলো সব...
তাই তো সহস্র পাখির কলতানে আজ দিগন্ত মুখর
তাই তো আজ দ্যাখো এ মিছিলে এসে দাঁড়িয়েছেন আমার মা
যিনি বাংলা ভাষায় কথা বলতে বড়ো ভালোবাসেন
কথায় কথায় কথকতা কতো রূপকথা
আর ছড়ার ছন্দে মিষ্টি সুরের ফুল ছড়ান
যিনি এখনো এ মিছিলে গুন গুন করে গাইতে পারেন
পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥

১. এই কবিতায় কিছু চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ‘কাঁপলো’ এবং ‘দাঁড়িয়েছেন’। প্রসঙ্গত দুটি শব্দই ক্রিয়া। চন্দ্রবিন্দু দিয়ে শুরু এমন পাঁচটি অন্য ক্রিয়া ব্যবহার করে পাঁচটি বাক্য লেখো।

একটি করে দেওয়া হলো, ‘হাঁটা’।

২. গুনগুন: মৌমাছি যেভাবে ডানার একটানা আওয়াজ করে, তাকে গুনগুন বলে। বাস্তব ধ্বনির অনুকরণে তৈরি হওয়া এই ধরনের শব্দকে বলে অনুকারী বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ। নীচে কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ শিখে নিতে পারবে।

ক	খ
পাখা	চলছে কল কল করে।
মাছিটা	বাসনগুলো ঝন ঝন করে ভেঙে গেল।
হাওয়া	পড়ল কড় কড় শব্দ করে।
নদী	বন বন করে ঘুরছে।
কাচের	সন সন করে বইছে।
বাজ	পড়ল ধুপ ধাপ করে।
পটকা	ফর ফর করে ছিঁড়ে গেল।
বৃষ্টি	পড়ছিল ঝর ঝর করে।
কাগজটা	ভন ভন করে উড়ছিলো।
কয়েকটা তাল	ফাটছিল দুম দাম করে।

৩. ‘আমার মায়ের গাওয়া কত না গানের কলি’— এখানে ‘মায়ের গাওয়া’ শব্দবন্ধটি একটি বিশেষণের কাজ করছে। এরকম আরো অন্তত পাঁচটি তৈরি করো।

একটি করে দেওয়া হলো, ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়’

৪. **নীচের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্তন করে বাক্য রচনা করো :**

সুর, দেশ, মাঠ, বন, মিষ্টি, মুখর, ইতিহাস, ফুল।

৫. ‘রব’ শব্দটিকে একবার বিশেষ্য এবং একবার ক্রিয়া হিসেবে দুটি আলাদা বাক্যে ব্যবহার করে দেখাও।

৬. ‘কলি’, ‘সুর’, ‘পাল’— শব্দগুলিকে দুটি করে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে আলাদা বাক্যে লেখো।

৭. ‘মুখ’ শব্দটিকে পাঁচটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করে পাঁচটি আলাদা বাক্য লেখো।

শব্দার্থ : রব— শব্দ, ধ্বনি। জারি— বাংলার মুসলমানি পল্লীসংগীত বিশেষ। পোহাইল— শেষ হলো। সারি— মাঝি-মাল্লাদের গানবিশেষ। কানন— উদ্যান, বাগান। ভাটিয়ালি—মাঝি-মাল্লাদের গান। কুসুমকলি—পুষ্প কলিকা, ফুলের কুঁড়ি। মুর্শিদি— বাস্তব বিষয়ক দেহতত্ত্বের গান। মন্ত্র— পবিত্র শব্দ বা বাক্য। গানের কলি— গানের চরণ বা পদ। কালবৈশাখী— চৈত্র-বৈশাখ মাসের বিকালের ঝড়বৃষ্টি। কথকতা—পাঠ বা ব্যাখ্যা। মিছিল— শোভাযাত্রা। রাখাল— গো-রক্ষক, গোরু চরানো ও তত্ত্বাবধান যার কাজ। বিন্নিধান — জমা জলে জন্মানো একপ্রকার আউশধান, এই ধানের খই ভালো হয়। পাঠ— পঠন, অধ্যয়ন, পাঠ্য বিষয়।

৮. **প্রত্যয় নির্ণয় করো :**

কথকতা, মুর্শিদি, মুখর, পোহাইল, ভাটিয়ালি।

৯. **নিম্নরেখ অংশগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় করো :**

৯.১ পাখি সব করে রব।

৯.২ কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।

৯.৩ তাই তো সহস্র পাখির কলতানে আজ দিগন্ত মুখর।

৯.৪ তিনি বাংলাভাষায় কথা বলতে বড়ো ভালোবাসেন।

৯.৫ রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।

১০. একটি-দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

১০.১ ‘‘পাখি সব করে রব’’— উদ্ধৃতাংশটি কার লেখা কোন কবিতার অংশ? কবিতাটি তাঁর লেখা কোন বইতে রয়েছে?

১০.২ এই পঙক্তিটি পাঠের সুরকে ‘মন্ত্রের মতো ’ বলা হয়েছে কেন?

১০.৩ এই সুরকে কেন ‘স্মৃতির মধুভাণ্ডার’ বলা হয়েছে? তা কবির মনে কোন স্মৃতি জাগিয়ে তোলে?

১০.৪ ‘‘সেই আমার দেশ-মাঠ-বন-নদী’’— দুই বঙ্গ মিলিয়ে তিনটি অরণ্য ও পাঁচটি নদীর নাম লেখো।

১০.৫ টীকা লেখো: জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, বিন্নি ধান, কথকতা, রূপকথা।

১০.৬ তোমার জানা দুটি পৃথক লোকসংগীতের ধারার নাম লেখো।

১০.৭ ‘‘ইতিহাস থমকে দাঁড়িয়ে লিখে নিলো সব’’— ‘সব’ বলতে এখানে কী কী বোঝানো হয়েছে?

১০.৮ ‘‘ তাই তো সহস্র পাখির কলতানে আজ দিগন্ত মুখর’’—‘সহস্র পাখি’ কাদের বলা হয়েছে?

১১. ব্যাখ্যা করো :

১১.১ ‘কয়েকটি পাখি...পড়ে গেল মাটিতে’।

১১.২ ‘ সেই শোকে কালবৈশাখীর ঝড় উঠলো আকাশে।’

১১.৩ ‘ কথায় কথায় কথকতা কতো রূপকথা’।

১১.৪ ‘তাই তো আজ দ্যাখো এ মিছিলে এসে দাঁড়িয়েছেন আমার মা।’

১২. আট-দশটি বাক্যে উত্তর দাও :

১২.১ এই কবিতায় 'পাখি'- শব্দের ব্যবহার কতখানি সার্থক হয়েছে তা কবিতার বিভিন্ন পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে আলোচনা করো।

১২.২ কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭) : জন্ম টাঙ্গাইলে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও লেখক এবং খ্যাতনামা লোকতত্ত্ববিদ। পাক্ষিক 'মুকুল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বিষকন্যা', 'উত্তর আকাশের তারা', 'কাগজের নৌকা' প্রভৃতি।

ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা শহীদ দিবস : ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা পাবার পর তৎকালীন ভারতবর্ষকে দুটি দেশে ভাগ করে দেওয়া হয়। ভারত ও পাকিস্তান। পাকিস্তান দেশটাকে গড়া হয় ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিমদিকের অংশ নিয়ে। যাদের মধ্যে ভৌগোলিক কিংবা ভাষা-সংস্কৃতিগত কোনো যোগাযোগ ছিল না। এই দেশের মূল শাসনের ভার পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর। ফলস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানেও বাংলার বদলে উর্দুকে রাষ্ট্রীয়ভাষা হিসেবে চালানোর চেষ্টা চলে। মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতায় উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে খাজা নাজিমুদ্দিন সরকারের পুলিশ গুলি চালায়। মারা যান আব্দুল সালাম, রফিক উদ্দিন আহমেদ, সফিউর রহমান, আবদুল বরকত এবং আব্দুল জব্বার। এঁরাই প্রথম ভাষা শহীদ। এঁদের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে গণআন্দোলন তুঙ্গে ওঠে এবং ১৯৭১-এ স্বাধীন জনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলন সমাপ্ত হয়।

১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বর ইউনেস্‌কো ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দেয়।

* পাখি সব করে রব— মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮) লিখিত তিনখণ্ডে সমাপ্ত 'শিশুশিক্ষা' (প্রথম ভাগ) থেকে গৃহীত। কবিতাটির নাম 'প্রভাতবর্ণন'।

১৩. '' শুধু মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়বদ্ধতার প্রকাশ নয়, এই কবিতায় রয়েছে আবহমানের ও অমরতার প্রতি বিশ্বাস''— পাঠ্য কবিতাটি অবলম্বনে উপরের উদ্ধৃতিটি আলোচনা করো।

১৪. মনে করো তুমি এমন কোনো জায়গায় দীর্ঘদিনের জন্য যেতে বাধ্য হয়েছো যেখানে কেউ তোমার মাতৃভাষা বোঝেন না। নিজের ভাষায় কথা বলতে না পারার যন্ত্রণা জানিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

১৫. তোমার বিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' কীভাবে পালিত হয়ে থাকে, তা জানিয়ে প্রিয় বন্ধুকে চিঠি লেখো।

একুশের তাৎপর্য

আবুল ফজল

ভাষা কী ও কেন, ভাষা দিয়ে কী হয় ব্যক্তি আর জাতির? ভাষা না হলে আর না থাকলে কী চলে না? এসব প্রশ্নের উত্তরেই নিহিত রয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি তথা ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য। ভাষাই মানুষকে মানুষ করে তোলে—ভাষা ছাড়া মানুষ ভাবতে পারে না, কল্পনা করতে পারে না, পারে না চিন্তা করতে পর্যন্ত। মানুষ একই সঙ্গে প্রকাশ আর বিকাশধর্মী জীব। ভাষা ছাড়া মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে অক্ষম, মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশও ভাষাকে অবলম্বন করেই ঘটে। তাই ব্যক্তির ব্যক্তি হয়ে উঠতেই চাই ভাষা। ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিজীবনের বিকাশও ঘটে ভাষার সাহায্যেই।

ভাষা ছাড়া জাতিও জাতি হয়ে উঠতে পারে না —বিশেষ একটা ভাষাকে কেন্দ্র করেই জাতীয় সত্তা রূপ পায় ও গড়ে ওঠে। এ বিশেষ ভাষা যে মাতৃভাষা তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই ব্যক্তি-জীবন ও জাতীয় জীবন উভয় ক্ষেত্রেই মাতৃভাষা ও মাতৃভাষার সাহিত্য অপরিহার্য। জাতির সাহিত্য, শিল্প, সভ্যতা , সংস্কৃতি সব কিছুরই প্রাণ হচ্ছে তার মাতৃভাষা ও মাতৃভাষার সাহিত্য। তাই মাতৃভাষার ইজ্জত আর অস্তিত্ব নিয়ে কোনো আপস চলে না। প্রাণ আর রক্তের বিনিময়ে হলেও মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে হয়। মাতৃভাষার দাবি স্বভাবের দাবি, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার দাবি। এ দাবি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেই একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদেরা প্রাণ দিয়েছিলেন—প্রাণ দিয়ে তাঁরা শুধু আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকেই বাঁচাননি, আমাদেরও বাঁচার পথ করে দিয়েছেন। তাই তাঁরা ও তাঁদের স্মৃতি চিরস্মরণীয়। ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়ার এমন অনন্য দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদেরা আমাদের অনন্য গৌরব ও আমাদের গর্ব।

একুশে ফেব্রুয়ারির অশ্রুসিক্ত ইতিহাস প্রতি বছর ফিরে এসে আমাদের সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর স্মরণ করিয়ে দেয় মাতৃভাষার প্রতি আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব। একুশে ফেব্রুয়ারিকে সার্থক করতে হলে একুশে ফেব্রুয়ারির এ তাৎপর্য বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে বছরের শুধু এক দিন নয়; সারা বছর ধরেই।

আবুল ফজল (১৯০৩—১৯৮৩) : জন্ম চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। সমাজ ও সমকাল সচেতন প্রাবন্ধিক ও কথাশিল্পী। উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক লিখেছেন অনেকগুলি। 'রেখাচিত্র' গ্রন্থের জন্য 'আদমজি পুরস্কার' লাভ করেন। সম্পাদনা করেছেন 'শিখা' পত্রিকা। রচনাংশটি তাঁর 'একুশ মানে মাথা নত না করা' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

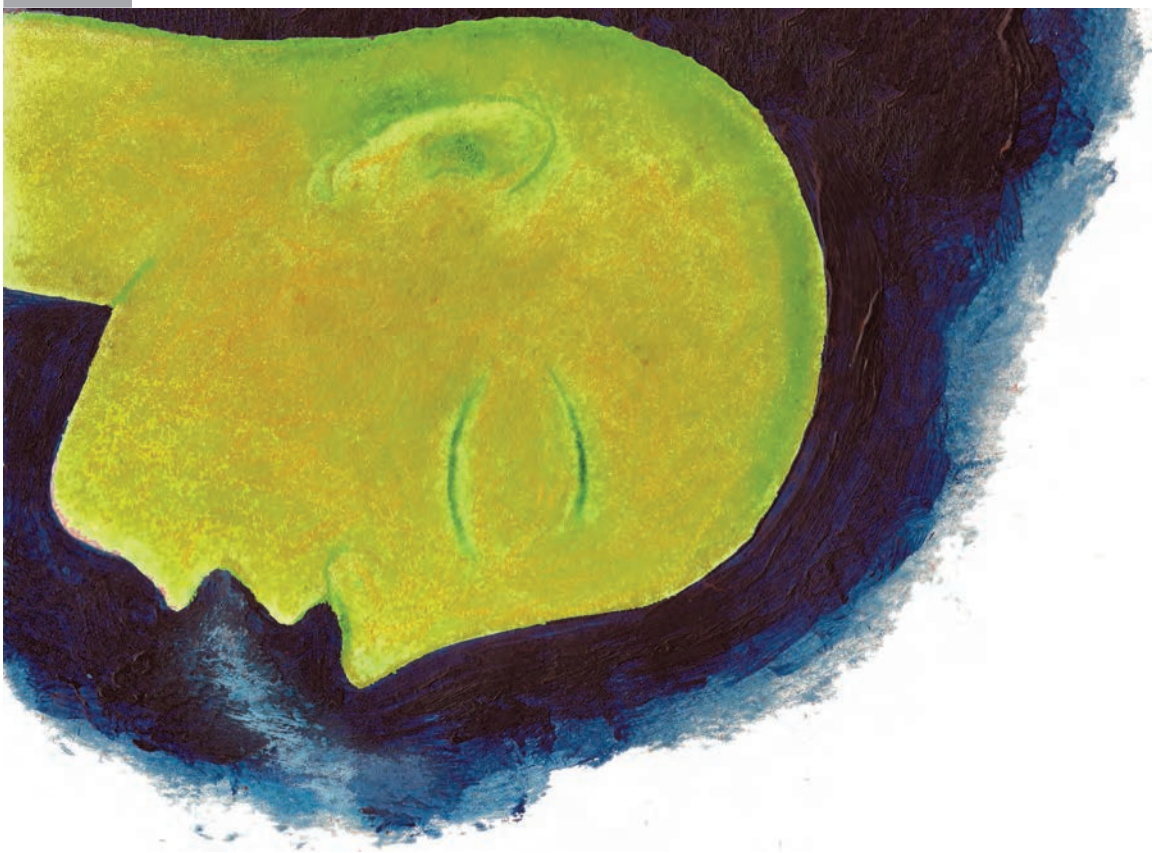

নানান দেশে নানান ভাষা

রামনিধি গুপ্ত

নানান দেশে নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা?
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর
ধরা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥

রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) : টপ্পা গানের অন্যতম প্রবর্তক। আখড়াই গানেরও তিনি আদিপুরুষ। তাঁর প্রধান গীতিগ্রন্থ 'গীতরত্ন'।

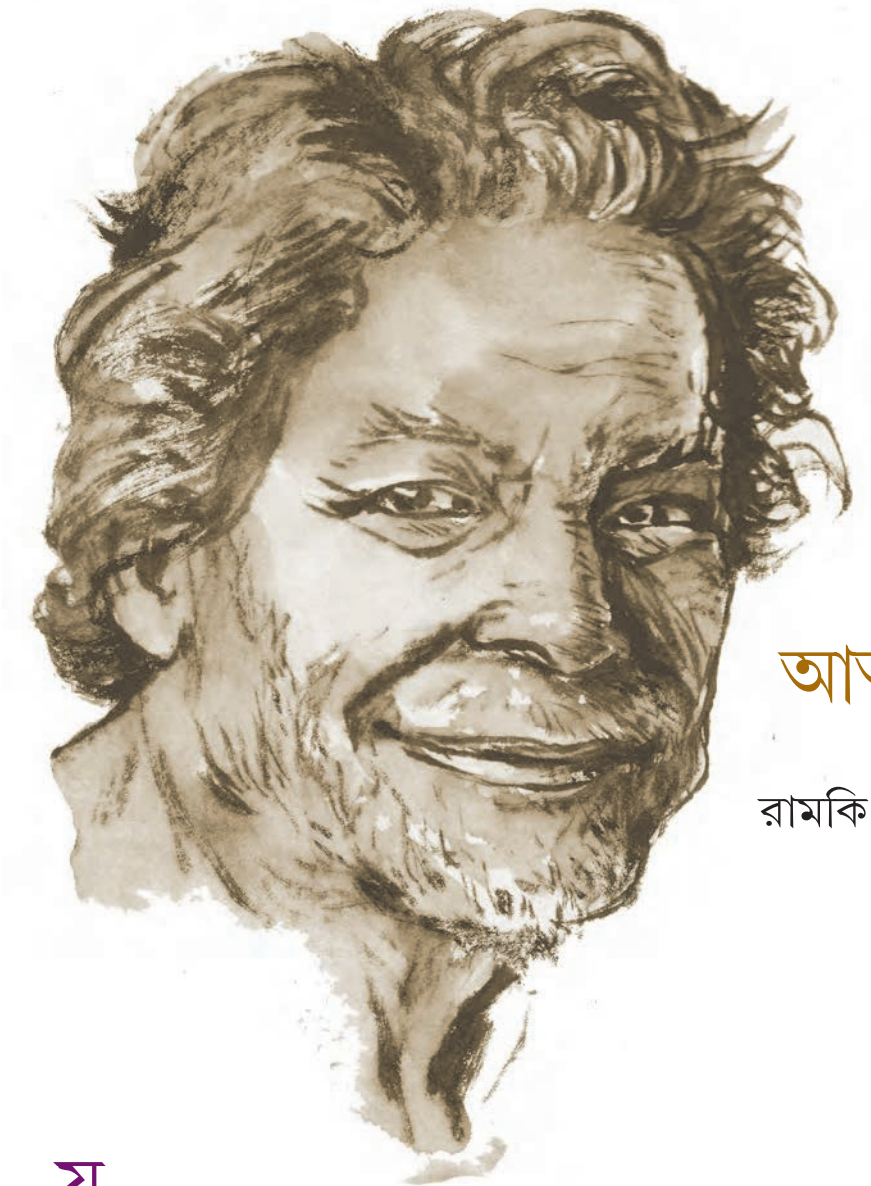

আত্মকথা

রামকিঙ্কর বেইজ

যতদূর মনে পড়ে শৈশবেই আমার চোখে পড়ত আমাদের বাড়িঘরের চারদিকের দেওয়ালে নানা দেবদেবীর ছবি, ছবি আমার তখনই ভালো লাগত। ছোটোবেলাতে আমি সেই-সব দেখতাম আর কপি করতাম। ভিসুয়াল আর্টে আমার প্রথম বর্ণপরিচয়।

মূর্তিগড়ার ইতিহাসও খুব মজার। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা লাল-মোরামে ঢাকা ছিল। একদিন হঠাৎ বৃষ্টির পরে দেখি মোরাম ধুয়ে নীলরঙের মাটি বেরিয়ে পড়েছে। চোখে পড়ামাত্র সেই মাটি খাবলে তুলে নিয়ে নানারকম পুতুল তৈরিও করতে লাগলাম। এখানে বলে রাখা ভালো যে আমার প্রথম শিল্পের-ইস্কুল বাড়ির পাশের কুমোরপাড়া। ছেলেবেলা থেকেই অনেকক্ষণ ধরে কুমোরদের মূর্তি গড়া ও অন্যান্য কাজ দেখার বেশ অভ্যেস ছিল। সুযোগ পেলেই মাটিতে হাত লাগিয়ে ছানাছানি করতাম।

রঙের প্রয়োজনও ছিল। গাছের পাতার রস, বাটনা-বাটা শিলের হলুদ, মেয়েদের পায়ের আলতা, মুড়ি-ভাজা খোলার চাঁছা ভুষোকালি—এইগুলি রঙের প্রয়োজন মেটাত। পাড়ার প্রতিমাকারক মিস্ত্রিদের দেখে ছাগলের ঘাড়ের লোম কেটে নিয়ে বাঁশের কাঠির ডগায় বেঁধে নিয়ে তাতে তুলির কাজ হতো।

বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় আমার অঙ্কন-গুণটির জন্য স্কুলে আমি অবৈতনিক ছাত্র হিসাবে পড়াশুনার সুযোগ পেয়ে এসেছি। স্কুলের দেওয়ালে আঁকা-ছবি ঝোলানো আর পত্রিকায় ছবি দেওয়া আমার প্রতিমাসের কাজ ছিল।

ছোটোবেলাতে পড়াশুনা ভালো লাগত না। বাবা লিখতে দিলে আঁকতে শুরু করতাম। বাঁকুড়াতে ঠেলাঠেলি করে ম্যাট্রিক পর্যন্ত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে এসে পড়েছি। কিন্তু তা অ্যাকাডেমিক নয়। ইচ্ছে মতো পড়তাম।

এই-সবের মধ্যে কখন নন্-কোঅপারেশন আন্দোলন এসে গেল। স্কুল-কলেজ বন্ধ। ন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি হলাম আর কংগ্রেসের কাজে যোগ দিলাম। আমার উপর ভার ছিল মহাপুরুষদের বাণী থেকে উদ্ধৃতি লিখে ঝুলিয়ে দেওয়া আর প্রসেশনের সময় লিডারদের পোর্ট্রেট এঁকে দেওয়া। সেগুলি অয়েলপেন্ট দিয়ে করতে হতো।

এইসময় শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঁকুড়ায় আসেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁরই কৃপায় ঘটে। সেটা হচ্ছে ১৯২৫ সাল। আমার এত আনন্দ হলো যে ম্যাট্রিক না দিয়েই চলে এলাম। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনই ব্রিটিশ কর্তৃত্বের বাইরে।

চলে এলাম। এটা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। তিনি (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) জেনারেল লাইব্রেরির উপরতলায় কলাভবনে নিয়ে গেলেন এবং আচার্য নন্দলালবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন নন্দলালবাবুর শিল্প সম্বন্ধে আমার ধারণা বেশি কিছু ছিল না। যা কিছু প্রবাসী'র অ্যালবামে দেখেছি। তা-ও বেশি নয়। ভারতীয় শিল্প ভালো লাগত না তা নয়— কিন্তু বাস্তবতার ভিতর দিয়ে না-গেলে সেটা সার্থক হবে না— এটাই ছিল মূল ধারণা। যার ফলে পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে প্রাকৃতিক বাস্তবতার সূচনা হয়েছে। এখনো চলছে। ছাত্রদের অ্যানাটমি ও মাস্‌ল সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

আমরা কাজ করতাম নিজেদের ইচ্ছামতন। নন্দবাবু নিজের কাজ করতেন। একবার করে ঘুরে যেতেন। বিশেষ কিছু ইনস্ট্রাকশন দিতেন না। তবে হ্যাঁ, একটু আধটু যা না-বললেই না, তা কি আর বলতেন না? কিন্তু নিজে ইমপোজ করতেন না। পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

অয়েল পেন্টিং তখন শান্তিনিকেতনে কেউ করতেন না। আমিই প্রথম শুরু করি। দোকানে গিয়ে বললাম, 'অয়েল-পেন্টিং করব, কী রং আছে? কীভাবে করতে হয়, দেখান?' তা দোকানদার দেখাল, 'এই তুলি, এই টিউবে রং আর এই পাত্রে তেল আছে, একবার ডুবিয়ে নিয়ে রং করুন।' ব্যস, অয়েল পেন্টিং শেখা হয়ে গেল। ভালো কাজ করেছিলাম অয়েলে, যতদূর মনে হচ্ছে— গার্ল অ্যান্ড দ্য ডগ। নন্দলালবাবু কিন্তু একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন অয়েলে করেছিলাম বলে। তবে বাধাও দেননি। আমি শান্তিনিকেতনে আসার বছর-চারেক আগে নন্দলালমশাই কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। ছাত্রদের সঙ্গে ওঁর ব্যবহার খুব সুন্দর ছিল। সকলেই খুব সাহায্য করতেন। তবে তিনি তো ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রবর্তক। ওয়েস্টার্ন আর্টের প্রচলন তখনো হয়নি। উনি পছন্দও করতেন না।

আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা হলো। দেখলেম বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে ধুতি। আমার ছবি দেখতে চাইলেন। দেখালাম। বললেন, 'তুমি সবই জানো, আবার এখানে কেন?' একটু ভেবে বললেন, 'আচ্ছা, দু-তিন বছর থাকো তো।' সেই দু-তিন বছর আমার এখনো শেষ হলো না। তাঁর বিচিত্র অবদানের ভিতর দেখেছি শিল্প স্রোত নানাভাবে নানারূপে এসেছে তীব্রভাবে, কিন্তু কখনো স্বাদবিহীন নয়।

অত বড়ো একজন শিল্পীর কাছে শিক্ষালাভ করেছি, আমার সৌভাগ্য। শিল্পী হিসাবে যেমন মর্যাদাবান, শিক্ষক হিসেবেও তেমনি। এত বড়ো পেইন্টার, এত নিখুঁত স্ট্রোক। প্রায় সমস্ত ছবিরই বিষয় বা ব্যাকগ্রাউন্ড খুব সাদামাটা। সাধারণ চরিত্র, কমন ল্যান্ডস্কেপ, একেবারে গ্রামের কমপ্লিট ক্যারেকটার নিয়ে ওঁর ছবি। এই সাদামাটা সুরটাই আমাকে ভীষণভাবে টানে। আমার ছবি বা মূর্তির অধিকাংশ ক্যারেকটারই যে খুব সাধারণ, তা অনেকটা নন্দলালবাবুর পরোক্ষ প্রভাবে। *(নির্বাচিত অংশ)*

রামকিঙ্কর বেইজের আঁকা একটি প্রতিকৃতি

হাতেকলমে

১. **ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে বাক্যটি আবার লেখো :**

১.১ রামকিঙ্করের প্রথম শিল্পের-ইস্কুল বাড়ির পাশের—কামারপাড়া/কুমোরপাড়া/পটুয়াপাড়া।

১.২ ‘পোট্রেট’ শব্দটির অর্থ হলো—প্রতিকৃতি/আত্ম-প্রতিকৃতি/প্রকৃতির ছবি।

১.৩ ‘অয়েল পেন্টিং’ বলতে বোঝায়—জলরঙে আঁকা ছবি/মোমরঙে আঁকা ছবি/তেলরঙে আঁকা ছবি।

১.৪ রামকিঙ্করের ছবি বা মূর্তি অধিকাংশ ক্যারেকটারই যে খুব— অসাধারণ/সাধারণ/নগণ্য।

২. **একই অর্থ-যুক্ত শব্দ রচনাংশ থেকে বেছে নিয়ে লেখো :**

বিনা ব্যয়ে, অভ্যুত্থান, দরকার, নিপুণ, সম্মাননীয়।

৩. **বিশেষ্য থেকে বিশেষণ এবং বিশেষণ থেকে বিশেষ্য বদলাও :**

সার্থক, সুন্দর, মূর্তি, চরিত্র, উদ্ধৃতি

শব্দার্থ : কপি— অনুকরণ/নকল। ভিসুয়াল আর্ট— ছবি/চিত্রকলা। অ্যাকাডেমিক— প্রথাগত লেখাপড়া। নন্-কোঅপারেশন— অসহযোগ আন্দোলন। প্রসেশন— শোভাযাত্রা। পোট্রেট— প্রতিকৃতি। অয়েল পেন্ট— তৈলচিত্র। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়— ‘প্রবাসী’ পত্রিকার সম্পাদক। অ্যানাটমি— শরীরতত্ত্ব। মাসল—পেশি। ইনস্ট্রাকশন— নির্দেশ। ইমপোজ— আরোপ। ওরিয়েন্টাল আর্ট—শিল্পকলার প্রাচ্যধারা। ওয়েস্টার্ন আর্ট— শিল্পকলার পাশ্চাত্যধারা। পেইন্টার— শিল্পী।

৪. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৪.১ কী কী দিয়ে শিল্পী রামকিঙ্কর রঙের প্রয়োজন মেটাতেন?

৪.২ কার সৌজন্যে রামকিঙ্করের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের যোগাযোগ হয়?

৪.৩ শান্তিনিকেতনের আচার্য নন্দলাল বসু কাজের ক্ষেত্রে কেমন মনোভাব দেখাতেন?

৪.৪ নন্দলাল বসুর কাজের কোন দিকটা শিল্পী রামকিঙ্করকে বেশি প্রভাবিত করেছিল?

৫. **নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও বিষয়গুলি নিয়ে দু-একটি বাক্য লেখো :**

নন্-কোঅপারেশন মুভমেন্ট, অয়েল পেন্টিং, আচার্য নন্দলাল বসু, ল্যান্ডস্কেপ।

৬. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৬.১ ‘ভিসুয়াল আর্টে আমার প্রথম বর্ণপরিচয়’— শিল্পী রামকিঙ্করের ছবির সঙ্গে প্রথম বর্ণপরিচয় হয়েছিলো কী ভাবে?

৬.২ ‘জেনারেল লাইব্রেরির উপরতলায় কলাভবনে নিয়ে গেলেন’— কে কাকে নিয়ে গিয়েছিলেন? তারপর কী ঘটেছিলো?

৬.৩ ‘যতদূর মনে হচ্ছে—গার্ল অ্যান্ড দ্য ডগ’— কার উক্তি? ‘গার্ল অ্যান্ড দ্য ডগ’ কীসের নাম? তিনি কী ভাবে এ ধরনের কাজ শিখলেন?

৬.৪ ‘এই সাদামাটা সুরটা আমাকে ভীষণভাবে টানে’— কাকে টানে? ‘সাদামাটা সুর’ বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন? তাঁকে এই সুর টানে কেন?

৭. ‘সাহিত্য মেলা’ বইয়ের কোনো একটি কবিতা বা গল্প বা কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তুমি একটি ছবি এঁকে দেখাও। নিজের আঁকা ছবি নিয়ে পাঁচ/ছয়টি বাক্য লিখে নিজের মতামত জানাও।

রামকিঙ্করের স্কেচে মা ও ছেলে

রামকিঙ্কর বেইজ (১৯০৬-১৯৮০) : প্রখ্যাত ভাস্কর এবং চিত্রশিল্পী ছিলেন। ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন ছবি আঁকায় পারদর্শী। দেব-দেবীর ছবি আঁকতেন। কুমোর-কামারদের কাজেও আকৃষ্ট ছিলেন। পুতুল-গড়া, থিয়েটারের সিন-তৈরি, ছবি-আঁকা ইত্যাদি কাজে যুক্ত ছিলেন। শিল্পী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে শান্তিনিকেতনে ১৯২৫ সালে নিয়ে আসেন। তাঁর আঁকা ছবি দেখে নন্দলাল বসু বলেছিলেন, ‘তুমি সবই জানো, আবার এখানে কেন?’ সারাজীবন অজস্র ছবি এঁকেছেন, মূর্তি গড়েছেন। তাঁর ছবিতে, ভাস্কর্যে রাঢ় দেশের মাটি ও মানুষের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার নানা বিশেষত্ব তাঁর কাজে ধরা পড়েছে।

শান্তিনিকেতনে তাঁর গড়া বিখ্যাত মূর্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে—‘সুজাতা’, ‘হাটের সাঁওতাল পরিবার’, ‘গান্ধিজি’, ‘বুদ্ধদেব’, ‘কাজের শেষে সাঁওতাল রমণী’ ইত্যাদি। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ‘বিশ্বভারতী’ তাঁকে ‘দেশিকোত্তম’ উপাধিতে ভূষিত করে।

রবীন্দ্রনাথের মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ

আঁকা, লেখা

মৃদুল দাশগুপ্ত

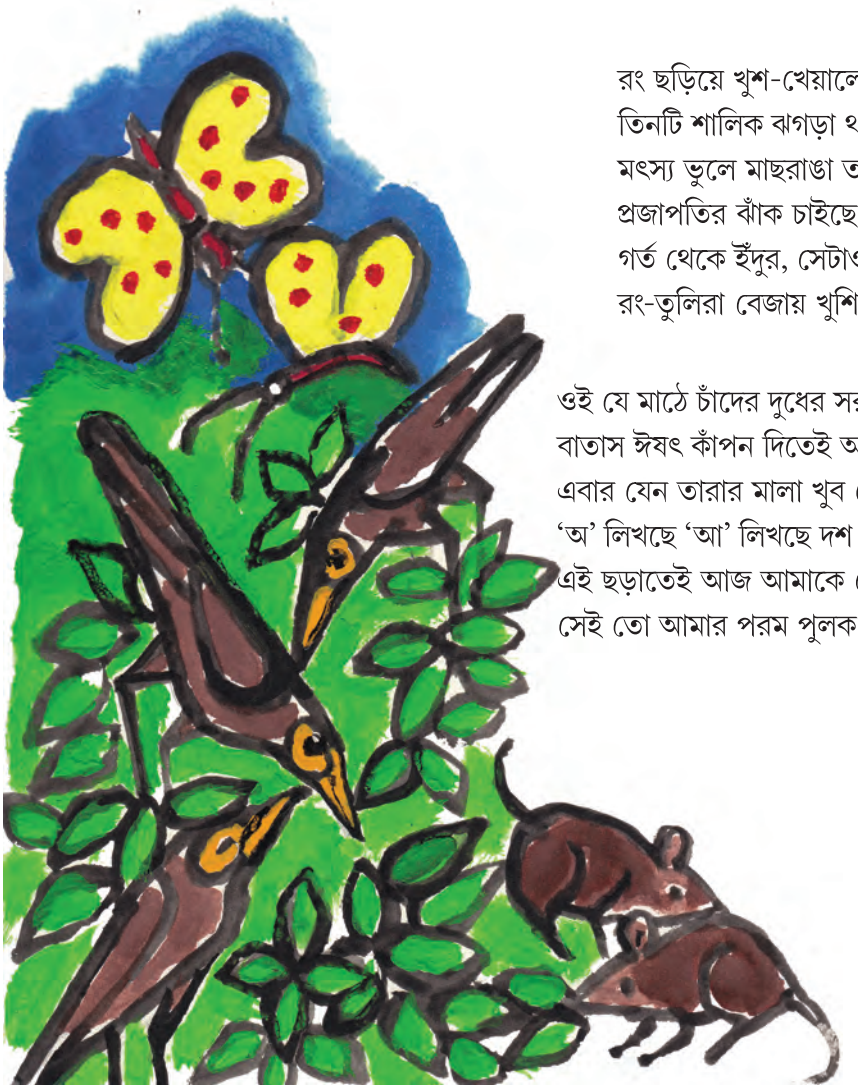

রং ছড়িয়ে খুশ-খেয়ালে আমি যখন চিত্র আঁকি
তিনটি শালিক ঝগড়া থামায়, অবাক তাকায় চড়ুই পাখি
মৎস্য ভুলে মাছরাঙা তার নীল রংটি ধার দিতে চায়
প্রজাপতির ঝাঁক চাইছে তাদের রাখি আমার আঁকায়
গর্ত থেকে ইঁদুর, সেটাও পিটপিটে চোখ দেখছে চেয়ে
রং-তুলিরা বেজায় খুশি আজ দুপুরে আমায় পেয়ে!

ওই যে মাঠে চাঁদের দুধের সর জমে যায় যখন পুরু
বাতাস ঈষৎ কাঁপন দিতেই আমার ছড়া লেখার শুরু
এবার যেন তারার মালা খুব গোপনে নামছে কাছে
'অ' লিখছে 'আ' লিখছে দশ জোনাকি বকুল গাছে
এই ছড়াতেই আজ আমাকে তোমার কাছে আনলো হাওয়া
সেই তো আমার পরম পুলক, সেই তো আমার পদক পাওয়া!

হাতেকলমে

১. ‘পিটপিটে চোখ’— শব্দটির মানে ‘যে চোখ পিটপিট করে তাকায়’। এইরকম আরো পাঁচটি শব্দ তৈরি করো। একটি করে দেওয়া হলো— কুড়মুড়ে চানাচুর।

২. **ঠিক বানানটি বেছে নাও:**

২.১ মৎস্য / মৎস / মৎশ্য, ২.২ দুধের স্বর / দুধের সর / দুধের শর,

২.৩ কাপন / কাঁপন / কাঁপণ, ২.৪ ঈশৎ / ইষৎ / ঈষৎ

শব্দার্থ: খুশ খেয়াল—খামখেয়াল, মর্জি। ঈষৎ—অল্প, কিঞ্চিৎ। চিত্র—ছবি, আলেখ্য, প্রতিলিপি। কাঁপন—কম্পন, স্পন্দন। মৎস্য—মাছ, মীন। পুলক—রোমাঞ্চ, আনন্দ। সর—দুধ, দই প্রভৃতির উপরের ঘন নরম আবরণ। পদক—কণ্ঠভূষণ, লকেট। পিটপিটে—মিটমিটে, আধচোখে দেখা। বেজায়—অত্যন্ত, খুব। পুরু —ঘন, স্থূল। পরম—চরম, অত্যন্ত।

৩. **নীচে দেওয়া শব্দগুলির সমার্থক শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :**

সামান্য, আনন্দ, মীন, নক্ষত্র, মূষিক।

৪. ‘কম্পন’ শব্দ থেকে এসেছে ‘কাঁপন’ শব্দটি, অর্থাৎ ‘ম্প’ যুক্তাক্ষরটি ভেঙে যাচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া ‘ম’ আগের ধ্বনিটিকে অনুনাসিক করে তুলেছে এবং একটি নতুন ‘আ’ ধ্বনি চলে আসছে। এই নিয়মটি মনে রেখে নীচের ছকটি সম্পূর্ণ করো।

চন্দ্র	>	□
চম্পা	>	□
	>	ঝাঁপ
ষণ্ড	>	
অঙ্ক	>	

৫. একসঙ্গে অনেক প্রজাপতি থাকলে আমরা বলি 'প্রজাপতির ঝাঁক'। এইভাবে আর কী কী শব্দ তৈরি করা যায় শব্দঝুড়ি থেকে শব্দ নিয়ে নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করে দেখো।

৫.১ ভেড়ার _____, ৫.২ কইমাছের _____,
৫.৩ হস্তী _____, ৫.৪ নৌকার _____,
৫.৫ সুপুরি গাছের _____, ৫.৬ ছাত্রদের _____,

সারি, যূথ
ঝাঁক, দল
বহর, পাল

৬. **নীচের বিশেষ্যগুলির বিশেষণের রূপ লেখো :**

রং, চিত্র, মাঠ, লেখা, পুলক।

৭. **নীচের বিশেষণগুলির পরে উপযুক্ত বিশেষ্য বসিয়ে বাক্য রচনা করো :**

৭.১ ঈষৎ _____, ৭.২ বেজায় _____, ৭.৩ পিটপিটে _____,
৭.৪ পরম _____, ৭.৫ নীল _____, ৭.৬ গোপন _____।

৮. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

গোপন, ঈষৎ, খুশি, পুরু, ঝগড়া।

৯. **নিম্নরেখ অংশগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :**

৯.১ তিনটি শালিক ঝগড়া থামায়।
৯.২ গর্ত থেকে ইঁদুর, সেটাও পিটপিটে চোখ দেখছে চেয়ে।
৯.৩ প্রজাপতির ঝাঁক চাইছে তাদের রাখি আমার আঁকায়।
৯.৪ এবার যেন তারার মালা খুব গোপনে নামছে কাছে।
৯.৫ সেই তো আমার পদক পাওয়া।

১০. **বাক্য বাড়াও :**

১০.১ আমি যখন আঁকি। (কী, কীভাবে?)
১০.২ চাঁদের দুধের সর জমে যায়। (কোথায়? কেমন?)
১০.৩ পিটপিটে চোখ দেখছে চেয়ে। (কে? কোথা থেকে?)
১০.৪ ছড়া লেখার শুরু। (কার? কখন?)
১০.৫ 'অ' লিখছে 'আ' লিখছে। (কারা? কোথায়?)

মৃদুল দাশগুপ্ত (১৯৫৫): হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে জন্ম। লেখাপড়া করেছেন উত্তরপাড়া কলেজে। বিষয় ছিল জীববিজ্ঞান। প্রথম কাব্যগ্রন্থ- 'জলপাই কাঠের এসরাজ'। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ- 'এভাবে কাঁদে না', 'গোপনে হিংসার কথা বলি', 'সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ' ইত্যাদি। ছোটোদের জন্য ছড়ার বই- 'ঝিকিমিকি ঝিরিঝিরি', 'ছড়া ৫০', 'আমপাতা জামপাতা'। প্রবন্ধগ্রন্থ- 'কবিতা সহায়'। তিনি বর্তমানে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত।

১১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১১.১ কবি কখন ছবি আঁকেন?

১১.২ কখন তাঁর ছড়া লেখার শুরু?

১১.৩ তিনটি শালিক কী করে?

১১.৪ কে অবাক তাকায়?

১১.৫ মাছরাঙা কী চায়?

১১.৬ প্রজাপতিদের ইচ্ছা কী?

১১.৭ গর্তে কে থাকে?

১১.৮ চাঁদের পুরু দুধের সর কোথায় জমে?

১১.৯ কারা, কোথায় অ-আ লিখছে?

১১.১০ কবি কোন বিষয়কে 'পদক পাওয়া' মনে করেছেন?

১২. দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

১২.১ কবি যখন ছড়া লিখতে শুরু করেন তখন চারপাশের প্রকৃতিতে কী কী পরিবর্তন ঘটে ?

১২.২ কবি যখন ছবি আঁকেন তখন কী কী ঘটনা ঘটে?

১২.৩ 'তিনটি শালিক ঝগড়া থামায়'—কোন কবির কোন কবিতায় এমন তিন শালিকের প্রসঙ্গ অন্যভাবে আছে?

১২.৪ মাছরাঙা পাখি কেমন দেখতে? সে মৎস্য ভুলে যায় কেন?

১২.৫ ''রং-তুলিরা বেজায় খুশি আজ দুপুরে আমায় পেয়ে।'' — কবির এমন বক্তব্যের কারণ কী?

১২.৬ ''অ' লিখছে 'আ' লিখছে'—কারা কীভাবে এমন লিখছে? তাদের দেখে কী মনে হচ্ছে?

১৩. অনধিক দশটি বাক্যে উত্তর দাও :

১৩.১ 'এই ছড়াতেই আজ আমাকে তোমার কাছে আনলো হাওয়া'—কাকে উদ্দেশ্য করে কবি একথা বলেছেন? কবির আঁকা এবং লেখা-র সঙ্গে এই মানুষটির উপস্থিতির সম্পর্ক এবং গুরুত্ব বিচার করো।

১৩.২ এই কবিতায় যে যে উপমা ও তুলনা ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি ব্যবহারের সার্থকতা বুঝিয়ে দাও।

১৩.৩ ছবি আঁকা, ছড়া/কবিতা লেখার মধ্যে তুমি নিজে কোনটা, কেন বেশি পছন্দ করো তা লেখো।

১৩.৪ তোমার নিজের লেখা ছড়া / কবিতা, নিজের আঁকা ছবিতে ভরিয়ে চার পাতার একটি হাতে লেখা পত্রিকা তৈরি করো। পত্রিকার একটি নাম দাও। তারপর শিক্ষিকা/ শিক্ষককে দেখিয়ে তাঁর মতামত জেনে নাও।

খোকনের প্রথম ছবি

বনফুল

খোকন এখন বড়ো হয়েছে। ক্লাস টেন-এ পড়ে। ছবি আঁকার দিকে খুব ঝোঁক হয়েছে তার। সে যখন খুব ছোটো ছিল কাগজের উপর রঙিন পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি কাটত। তারপর ক্রমশ বড়ো হলো, স্কুলে গেলো। স্কুলে ড্রইং শেখানো হতো। ড্রইং শিখতে লাগল খোকন। টুল, টেবিল, চেয়ার, কলসি, কাপ এমন কি একটা গোরুও এঁকে ফেলল একদিন। তারপর ড্রইং বুক থেকে কপি করে করে অনেক ছবি আঁকল সে। নানারকম ছবি। যেখানেই সে ছবি দেখত, দেখে দেখে এঁকে ফেলত। একদিন তার ড্রইংয়ের মাস্টারমশাই বললেন—প্রকৃতি থেকে ছবি আঁকো।

খোকন জিজ্ঞেস করলে—প্রকৃতি থেকে?

হ্যাঁ, তোমার চারপাশে তো অনেক ছবি ছড়িয়ে আছে। সেইগুলো দেখে দেখে আঁকো না এবার। তোমার বাড়ির সামনেই তো চমৎকার গাছ আছে একটি। তার ছবিটা এঁকে ফেলো একদিন।

খোকন সত্যি সত্যি এঁকে ফেলল একদিন ইউক্যালিপটাস গাছটাকে। মাস্টারমশাই বললেন—চমৎকার হয়েছে। আরো আঁকো। তোমাদের বাড়ির ছাদ থেকে যে পুলটা দেখা যায়, সেটা আঁকতে পারবে?

পারব—

পুলের ছবিটা দেখেও খুব প্রশংসা করলেন মাস্টারমশাই। বললেন, চারপাশে যা দেখবে এঁকে ফেলবে। খুব বড়ো চিত্রকর হবে তুমি।

খোকন মহা উৎসাহে আঁকতে লাগল ছবি। কিন্তু কিছুদিন পরে সে নিজেই বুঝতে পারল ঠিক হচ্ছে না। সূর্যের যে ছবিটা এঁকেছে সেটা তো সূর্যের মতো নয়। সূর্যের দীপ্তি তো ছবিতে ফোটেনি। গোলাপ ফুলের ছবিতে কি গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য ফোটাতে পেরেছে সে? পারেনি। প্রকৃতির ছবি ঠিক আঁকা যায় না। একদিন তো মেঘের ছবি আঁকতে গিয়ে বেকুব হয়ে গেল খোকন। একদিন সে দেখল আকাশে একটা মেঘ হাতির মতো। ঠিক যেন একটি হাতি পেছনের দুপায়ে ভর করে শুঁড় তুলে আছে। খোকন তাড়াতাড়ি তার ড্রইং খাতায় ছবিটা আঁকতে লাগল। আঁকা শেষ হবার পর মিলিয়ে দেখতে গেল ঠিক হয়েছে কিনা। গিয়ে দেখে—হাতি নেই, প্রকাণ্ড একটা কুমির শুয়ে আছে। হাতি কুমির হয়ে গেছে।

খোকনের বাবার একজন বন্ধু বিখ্যাত চিত্রকর। তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে থাকেন। একদিন তিনি খোকনদের বাড়িতে এলেন।

খোকনের বাবা তাঁকে বললেন—খোকনও ছবি আঁকছে।

তাই নাকি! দেখি দেখি—

খোকন সগর্বে তার ড্রইং খাতাগুলো নিয়ে এল।

ওরে বাস, অনেক ছবি এঁকেছ দেখছি—একে একে উল্টে বললেন, তোমার ছবি কই? এ সবই তো কপি করেছ। তুমি বড়ো হয়ে ক্যামেরা নিয়ে যদি এদের ফটো তোলো তাহলে এগুলো আরও নিখুঁত হবে। এগুলো সব নকল করা ছবি। তোমার নিজের আঁকা ছবি কই?

খোকন অবাক হয়ে গেল।

নিজের আঁকা ছবি? তা কী করে আঁকব?

চোখ বুজে বসে কল্পনা করো। কল্পনায় যা দেখবে সেটাই এঁকে ফেলো।

চিত্রকর চলে গেলেন।

খোকন একদিন নিজের ঘরে চোখ বুজে বসে রইল। অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না সে। খোকন ঠিক করল এই অন্ধকারেরই ছবি আঁকবে। কালো রং আর তুলি নিয়ে শুরু করে দিল আঁকতে। ড্রইং খাতার একটা পাতা কালো রঙে ভরে গেল।

তারপর সেটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল খোকন। এটা কী রকম ছবি হলো? এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তবু।

তারপর হঠাৎ দেখতে পেল ওই কালোর ভেতরই একটা মুখ রয়েছে। চোখও আছে। অদ্ভুত হাসি সে চোখে।

নিজের প্রথম সৃষ্টির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল খোকন।

বনফুল (১৮৯৯—১৯৭৯) : 'বনফুল' হলো সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। জন্ম বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারীতে। সাহেবগঞ্জ হাইস্কুলে পড়ার সময় ১৯১৫ তে তাঁর প্রথম কবিতা 'মালঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত। এরপর 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি 'বনফুল' ছদ্মনামে কবিতা লেখেন। পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড' ডাক্তারি জীবনের প্রথম দিকের রচনা। বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্রতম ছোটোগল্পেরও জনক তিনি। ছোটোগল্প, নাটক, উপন্যাস, কাব্য-সাহিত্যের সব শাখাতেই তিনি সমান দক্ষ। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য রচনা—'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'হাটেবাজারে', 'শ্রীমধুসূদন', 'বিদ্যাসাগর' প্রভৃতি। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'পশ্চাৎপট' রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী পদক' আর ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন।

শব্দার্থ : ঝোঁক— আগ্রহ/প্রবণতা। হিজিবিজি— আঁকিবুঁকি। ড্রইং—আঁকা। পুল—সেতু বা সাঁকো। চিত্রকর—শিল্পী, যিনি ছবি আঁকেন। নকল—অনুকরণ।

১. **গল্প থেকে একইরকম অর্থযুক্ত আর একটি করে শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো :**

শিল্পী, নগর, ঐরাবত, উজ্জ্বলতা, অনুকরণ।

২. **বিশেষ্য থেকে বিশেষণে রূপান্তরিত করো :**

প্রকৃতি, গাছ, কল্পনা, ফুল, দীপ্তি।

৩. **নিম্নরেখ অংশটির কারক বিভক্তি নির্ণয় করো :**

৩.১ প্রকৃতি থেকে ছবি আঁকো।

৩.২ তোমার ছবি কই?

৩.৩ একদিন তিনি খোকনদের বাড়িতে এলেন।

৩.৪ ড্রইং খাতার একটা পাতা কালো রঙে ভরে গেল।

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর দাও :**

৪.১ 'ড্রইং শিখতে লাগল খোকন'— খোকন কোথায় ড্রইং শিখত? আর প্রথমদিকে কী কী আঁকত?

৪.২ 'একদিন তো মেঘের ছবি আঁকতে গিয়ে বেকুব হয়ে গেল খোকন'— 'বেকুব' শব্দটির অর্থ কী? মেঘের ছবি আঁকতে গিয়ে খোকন বেকুব হয়ে গিয়েছিল কেন?

৪.৩ 'এগুলো সব নকল করা ছবি।'— কে কাকে এই কথা বলেছেন? 'নকল করা ছবি' বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন?

৫. **নীচের প্রতিটি বাক্যকে দুটি বাক্যে ভেঙে লেখো :**

৫.১ সে যখন খুব ছোটো কাগজের উপর রঙিন পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি কাটত।

৫.২ পুলের ছবিটা দেখেও খুব প্রশংসা করলেন মাস্টারমশাই।

৫.৩ সূর্যের যে ছবিটা এঁকেছে সেটা তো সূর্যের মতো নয়।

৫.৪ একদিন তো মেঘের ছবি আঁকতে গিয়ে বেকুব হয়ে গেল খোকন।

৫.৫ খোকন একদিন নিজের ঘরে চোখ বুজে বসে রইল।

৬ **নীচের আলাদা আলাদা বাক্যগুলি জুড়ে একটি বাক্য তৈরি করো :**

৬.১ খোকন বড়ো হয়েছে। ক্লাস টেন-এ পড়ে।

৬.২ খোকনের বাবার একজন বন্ধু বিখ্যাত চিত্রকর। তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে থাকেন।

৬.৩ নিজের আঁকা ছবি? তা কী করে আঁকব?

৬.৪ চোখ বুজে বসে কল্পনা করো। কল্পনায় যা দেখবে সেটাই এঁকে ফেলো।

৬.৫ তারপর হঠাৎ দেখতে পেল ওই কালোর ভেতরেই একটা মুখ রয়েছে। চোখও আছে।

৭. গল্পে রয়েছে এমন দশটি ইংরেজি শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো।

৮. 'খোকন জিজ্ঞেস করলে—প্রকৃতি থেকে?'—প্রশ্ন পরিহার করো।

৯. লক্ষ্ণৌ শহরটি কোথায়? সেখানকার একটি বিখ্যাত স্থাপত্যের নাম লেখো।

১০. খোকনের 'ড্রইংয়ের মাস্টারমশাই' কীভাবে খোকনকে প্রকৃতি দেখতে শিখিয়েছিলেন?

১১. প্রকৃতির দৃশ্যের যে বদল অহরহ হয় তা খোকন কীভাবে বুঝল?

১২. 'খোকন অবাক হয়ে গেল,' আর

'...অবাক হয়ে চেয়ে রইল খোকন।'

—এই দুই ক্ষেত্রে খোকনের 'অবাক' হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো।

১৩. 'চিত্রকর চলে গেলেন'

—এই চিত্রকরের পরিচয় দাও। চলে যাওয়ার আগে তিনি খোকনকে কী বলে গেলেন?

১৪. 'এই অন্ধকারেরই ছবি আঁকবে।'

—কখন খোকন এমন সিদ্ধান্ত নিল? অন্ধকারের সেই ছবির দিকে তাকিয়ে খোকন কী দেখতে পেল?

১৫. গল্পে 'খোকনের প্রথম ছবি' হিসেবে তুমি কোন ছবিটিকে স্বীকৃতি দেবে এবং কেন তা বুঝিয়ে লেখো।

১৬. পাঁচজন সাহিত্যিকের নাম এবং তাঁদের ছদ্মনাম পাশাপাশি লেখো। সাহিত্যিকেরা কেন ছদ্মনাম ব্যবহার করেন তা শিক্ষক/শিক্ষিকার থেকে জেনে নাও।

১৭. তুমি যদি বড়ো হয়ে সাহিত্যিক হও, কোন ছদ্মনাম তুমি ব্যবহার করবে এবং কেন— তা লেখো।

১৮. খোকনের ড্রইংয়ের মাস্টারমশাই আর তার বাবার এক বন্ধু যে যে ভাবে তাকে ছবি আঁকতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তা লেখো। কোন রীতিটিকে তোমার পছন্দ হলো এবং কেন তা যুক্তিসহ লেখো।

কুতুব মিনারের কথা

সৈয়দ মুজতবা আলি

কুতুব মিনার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিনার। ইংরেজ পর্যন্ত একথা স্বীকার করেছে। আশ্চর্য মনে হয় যে, এর পূর্ববর্তী নিদর্শন এদেশে নেই, ইরান-তুরানেও নেই। বহু স্থপতির বহু এক্সপেরিমেন্টের সম্পূর্ণ ফায়দা উঠিয়ে তাজ নির্মিত হলো—কিন্তু মিনারের ক্ষেত্রে কুতুব প্রথম এবং শেষ এক্সপেরিমেন্ট। এ ধরনের বিজয়স্তম্ভ পূর্বে কেউ করেনি; কাজেই গুণীজনের বিস্ময়ের অবধি নেই যে, হঠাৎ স্থপতি এ সাহস পেল কোথা থেকে? কানিংহাম, ফার্গুসন, কার স্টিফেন, স্যার সৈয়দ আহমেদ অনেক ভেবে-চিন্তেও এর কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

কুতুব পাঁচতলার মিনার। প্রথম তলাতে আছে 'বাঁশি' ও 'কোণে'র পর-পর সাজানো নকশা। দ্বিতীয় তলাতে শুধু বাঁশি, তৃতীয় তলাতে শুধু কোণ; চতুর্থ ও পঞ্চম তলাতে কী ছিল জানার উপায় নেই, কারণ বজ্রাঘাতে সে দুটি ভেঙে যাওয়ায় ফিরোজ তুগলক (যিনি অশোক স্তম্ভ দিল্লি আনেন; ইনি যেমন নিজে সোৎসাহে ইমরাত বানাতেন ঠিক তেমনি অকাতরে অন্যের ইমারত মেরামত করে দিতেন—দিল্লির অতি অল্প রাজাতেই এই দ্বিতীয় গুণটি পাওয়া যায়) সে দুটি মার্বেল দিয়ে মেরামত করে দেন। পঞ্চমটিতে নাকি আবার সিকন্দর লোদিরও হাত আছে। মিনারের মুকুটরূপে সর্বশেষে (যেখানে এখন আলো জ্বালানো হয়) কী ছিল সে সম্বন্ধে রসিকজনের কৌতূহলের অন্ত নেই। দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা মিনারকে স্থপতি কী রাজমুকুট পরিয়েছিলেন—সেখানেও তিনি তাল রেখে শেষরক্ষা করতে পেরেছিলেন কিনা, তাঁর যে অদ্ভুত কল্পনা-শক্তি মিনারের সর্বাঙ্গে স্বপ্রকাশ সে-কল্পনাশক্তি দিয়ে তিনি দর্শককে কোন দ্যুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কে জানে?

ইমারত তৈরি করা কত সোজা! কারিগরের হাতে সেখানে কত অজস্র মালমশলা! গম্বুজ, থাম, আর্চ, ছত্রি, মিনারেট, ছজ্জা (ড্রিপস্টোন), কার্নিস, ব্র্যাকেট কত কী! তার তুলনায় একটা সোজা খাড়া স্তম্ভে সৌন্দর্য আনা কত শক্ত! এখানে শিল্পী সফল হয়েছেন শুধু সেটাকে কয়েকটি তলাতে বিভক্ত করে, সামঞ্জস্য রেখে প্রতি তলায় তাকে একটু ছোটো করে করে, গুটিকয়েক ব্যালকনি লাগিয়ে দিয়ে এবং মিনারের গায়ে কখনো 'বাঁশি', কখনো 'কোণে'র নকশা কেটে। 'প্রপর্শনে'র এরকম চূড়ান্ত নিদর্শন পৃথিবীর আর কোনো মিনারে পাওয়া যায় না।

আর তার গায়ের কারুকার্যও অতি অদ্ভুত। বাঁশি ও কোণের উপর দিয়ে সমস্ত মিনারটিকে কোমরবন্ধের মতো ঘিরে রয়েছে সারি সারি লতা-পাতা, ফুলের মালা, চক্রের নকশা। এগুলো জাতে হিন্দু এবং এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এক সারি অন্তর অন্তর আরবি লেখার সার—সেগুলো জাতে মুসলমান। কিন্তু উভয় খোদাইয়ের কাজই যে হিন্দু শিল্পী করেছেন সে বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। গোটা মিনারটির পরিকল্পনা করেছেন মুসলমান, যাবতীয় কারুশিল্প করেছে হিন্দু—ভারতবর্ষে মুসলমানদের সর্বপ্রথম সৃষ্টি কার্যে হিন্দু-মুসলমান মিলে গিয়ে যে অদ্ভুত সাফল্য দেখিয়েছিল সে-মিলন পরবর্তী যুগে কখনো ভঙ্গ হয় নি, কভু বা মুসলমানের প্রাধান্য বেশি, কোনো ইমারতে হিন্দুদের প্রাধান্য বেশি। আটশত বছর একসঙ্গে থেকেও হিন্দু-মুসলমান চিন্তার ক্ষেত্রে, রাজনীতির জগতে এক হয়ে যেতে পারে নি, কিন্তু কলার প্রাঙ্গণে (স্থাপত্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যে) প্রথম দিনেই তাদের যে মিলন হয়েছিল আজও সেটি অটুট আছে।

কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর কেউ কোনো মিনার কখনো খাড়া করে নি। দীর্ঘ আট শতাব্দী ধরে বহু বাদশা বহু ইমারত গড়েছেন, কিন্তু 'কুতুবের চেয়ে ভালো মিনার গড়বো' এ সাহস কেউ দেখাননি। যে ইংরেজ

দিল্লিতে সেক্রেটারিয়েট,রাজভবন গড়ে, কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বানিয়ে নিজেকে অতুল বিড়ম্বিত করেছে সেও বিলক্ষণ জানতো কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোনো স্থপতির কর্ম নয়।

আলাউদ্দিন খিলজির মতো দুঃসাহসী রাজা ভারতবর্ষে কমই জন্মেছেন। একমাত্র তিনিই চেয়েছিলেন কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দিতে। তাই কুতুবের দ্বিগুণ ঘের দিয়ে তিনি আরেকটি মিনার গড়তে আরম্ভ করেন—বাসনা ছিল মিনারটি কুতুবের দ্বিগুণ উঁচু হবে। ইমারত মাত্রেরই একটা অপটিমাম সাইজ আছে— অর্থাৎ যার চেয়ে বড়ো হলে ইমারত খারাপ দেখায়, ছোটো হলেও খারাপ দেখায় (সর্বকলাতেই এ সূত্র প্রযোজ্য; কিন্তু স্থাপত্যের বেলা এটা অন্যতম মূলসূত্র)—কাজেই আলাউদ্দিনের চূড়া ডবল হলে ফল কী ওতরাতো বলা কঠিন। তা সে যা-ই হোক, মিনারের কাঠামোর কিছুটা শেষ হতে না হতেই ওপারের ডাক খিলজির কানে এসে পৌঁছল, যে-পারে খুব সম্ভব মিনার হাতে নিয়ে লাঠালাঠি চলে না।

কুতুব মিনারের গায়ের কাজ

আপন মহিমায় নিজস্ব ক্ষমতায় যে স্তম্ভ দাঁড়ায় তার নাম মিনার। মসজিদ, সমাধি কিংবা অন্য কোনো ইমারতের অঙ্গ হিসাবে যে মিনার কখনো থাকে, কখনো থাকে না, তার নাম মিনারেট—মিনারিকা। কুতুবের পর পাঠান মোগল বিস্তর মিনারেট গড়েছে; কিন্তু সেগুলোও কুতুবের কাছে আসতে পারে না। তাজের মিনারিকা ভুবনবিখ্যাত; কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিল্পী সেখানে নতমস্তকে হার মেনে নিয়ে সেটাকে সাদামাটার চরমে পৌঁছিয়ে খাড়া করেছেন। পাছে লোকে তার মিনারিকার সঙ্গে কুতুবের তুলনা করে লজ্জা দেয় তাই তিনি সেটাকে গড়েছেন এমন ন্যাড়া করে যে দর্শকের মন অজান্তেও যেন কুতুবকে স্মরণ না করে। না হলে যে-তাজের সর্বাঙ্গে গয়নার ছড়াছড়ি তার চারখানা মিনারিকা-হস্তে 'নোয়াটুকু'র চিহ্ন নেই কেন? ওদিকে দেখুন, হুমায়ুনের সমাধি-নির্মাতা ছিলেন আরও ঘোড়েল—তিনি তাঁর ইমারতটি গড়েছেন মিনারিকা সম্পূর্ণ বর্জন করে।

দিল্লি-আগ্রার বহু দূরে, কুতুবের আওতার বাইরে, গুজরাতের রাজধানী আহমদাবাদে আমি একটি মিনারিকা দেখেছি যার সঙ্গে কুতুবের কোনো মিল নেই এবং বোধহয় ঠিক সেই কারণেই তার নিজস্ব মূল্য আছে। রাজা আহমেদের—এঁরই নামে আহমদাবাদ—বেগম রানি সিপ্রির মসজিদে একটি মধুরদর্শন মিনারিকা বহু ভূপর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গুজরাত এবং রাজপুতানার মেয়েরা তাদের বাহুলতা মণিবন্ধে যে বিচিত্র-আকার, বিচিত্র-দর্শন অসংখ্য বলয়-কঙ্কণ পরে এ মিনারিকা যেন সেই কমনীয়তায় অনুপ্রাণিত। রাজেশ্বরী সিপ্রি যেন তাঁরই অনুপম হাতখানি নভোলোকের দিকে তুলে ধরেছেন ভুবনেশ্বরের ললাটে তিলক পরিয়ে দেবেন বলে।

হাতেকলমে

সৈয়দ মুজতবা আলি (১৯০৪—১৯৭৪) : জন্ম শ্রীহট্টের করিমগঞ্জে। বাবার নাম সৈয়দ সিকান্দর আলি। মহাত্মা গান্ধির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্কুল ছাড়েন। শান্তিনিকেতনে পড়া শেষ করে তিনি কাবুলের শিক্ষাবিভাগে অধ্যাপক হন। তিনি আরবি, ফারসি, জার্মান সহ ১৫টি ভাষা জানতেন। প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, উপন্যাস ও রম্য-রচনায় তাঁর দক্ষতা অসামান্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ‘দেশে বিদেশে’, ‘পঞ্চতন্ত্র’, ‘চাচাকাহিনি’, ‘ময়ূরকণ্ঠী’, ‘শবনম’, ‘ধূপছায়া’, ‘টুনিমেম’, ‘হিটলার’ প্রভৃতি। তিনি ‘নরসিংহদাস পুরস্কারে’ সম্মানিত।

১. অনধিক দুটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

১.১ কোন সম্রাট ‘অশোক স্তম্ভ’ কে দিল্লি নিয়ে এসেছিলেন?

১.২ কুতুব মিনার নামটি কার নামানুসারে রাখা হয়েছে এবং কেন?

১.৩ কুতুবের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য আর কে মিনার গড়তে চেষ্টা করেছিলেন?

১.৪ মিনারেট বা মিনারিকা কী? মিনারের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়?

১.৫ আহমদাবাদ শহরটি কোন রাজার নামানুসারে হয়েছে? এই শহরটি কোন রাজ্যের রাজধানী?

২. নীচে যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :

কানিংহাম, ফার্গুসন, সৈয়দ আহমেদ।

শব্দার্থ : মিনার— মোচার আকারে বা শাঁখের মতো ঊর্ধ্বমুখী উন্নত চূড়া। মোগল কলা— মুঘল আমলের শিল্প সংস্কৃতি। এক্সপেরিমেন্ট— পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সিক্রি— এখানে ফতেহ্‌পুর সিক্রি। স্থপতি— সৌধ, প্রাসাদ, ইমারত প্রভৃতি তৈরির কাজে নিযুক্ত। গুলদস্তাজ— মিনারেট জাতীয় ছোটো চূড়া বা শীর্ষদেশ। থাম— স্তম্ভ। আর্চ— খিলান। ছত্রি— চাল বা ছাদ। মিনারেট— মিনারের চেয়ে ছোটো চূড়া। ছজ্জা— বৃষ্টির ছাট ঠেকানোর জন্য দরজা বা জানলার উপরস্থিত ছাদের প্রলম্বিত অংশ। ব্র্যাকেট— প্রধানত দেওয়ালের গায়ে আটকানো তাকের প্রলম্বিত আলম্ব বা দেয়ালগিরি। প্রপর্শন— সঙ্গতি। অপটিমাম সাইজ— সামঞ্জস্যপূর্ণ আকার। ডোম— গোলাকার গম্বুজ। জিওমেট্রিক ডিজাইন— জ্যামিতিক বিন্যাস। দার্ঢ্য— দৃঢ়তা।

৩. কয়েকটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১ ‘কুতুব মিনার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিনার’— এই উদ্ধৃতিটির আলোকে মিনারটির পাঁচটি বিশিষ্টতা উল্লেখ করো।

৩.২ মিনারটির গঠনে হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক মিলনের চেহারাটি কীভাবে ধরা পড়েছে তা লেখো।

৩.৩ কুতুব মিনারের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতে গিয়ে লেখক আর কোন কোন স্থাপত্য কীর্তির প্রসঙ্গ এনেছেন?

৩.৪ আলাউদ্দিন খিলজি চেষ্টা করেও কুতুব মিনারের চেয়ে মহত্তর স্থাপত্য গড়তে পারেননি কেন?

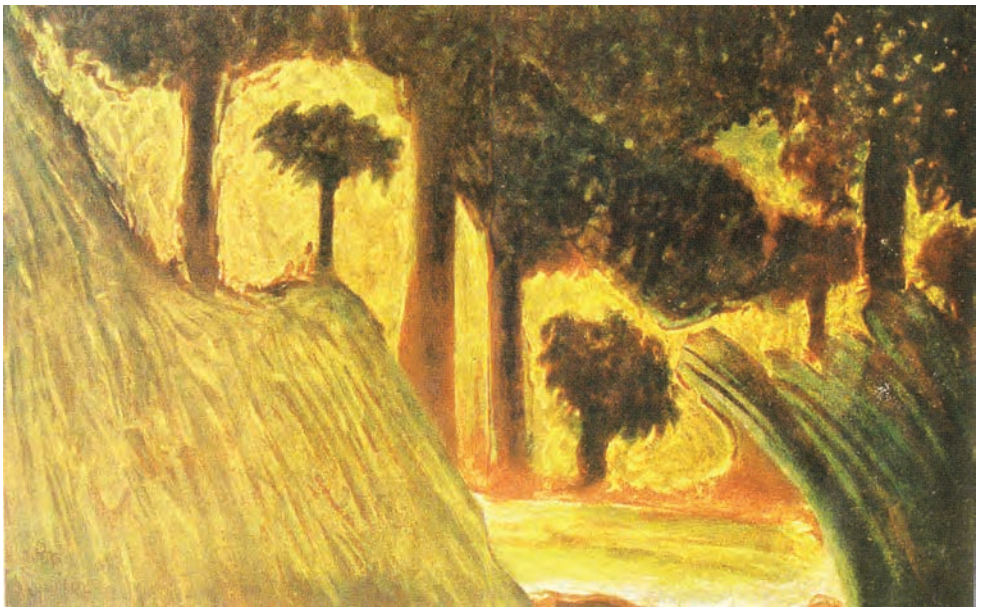

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা একটি ছবি

আজি দখিন-দুয়ার খোলা—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি দখিন-দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো।
দিব হৃদয়দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো॥
নব শ্যামল শোভন রথে এসো বকুলবিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু মেখে পিয়ালফুলের রেণু।
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো॥
এসো ঘনপল্লবপুঞ্জে এসো হে, এসো হে, এসো হে।
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে এসো হে, এসো হে, এসো হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে এসো পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো॥

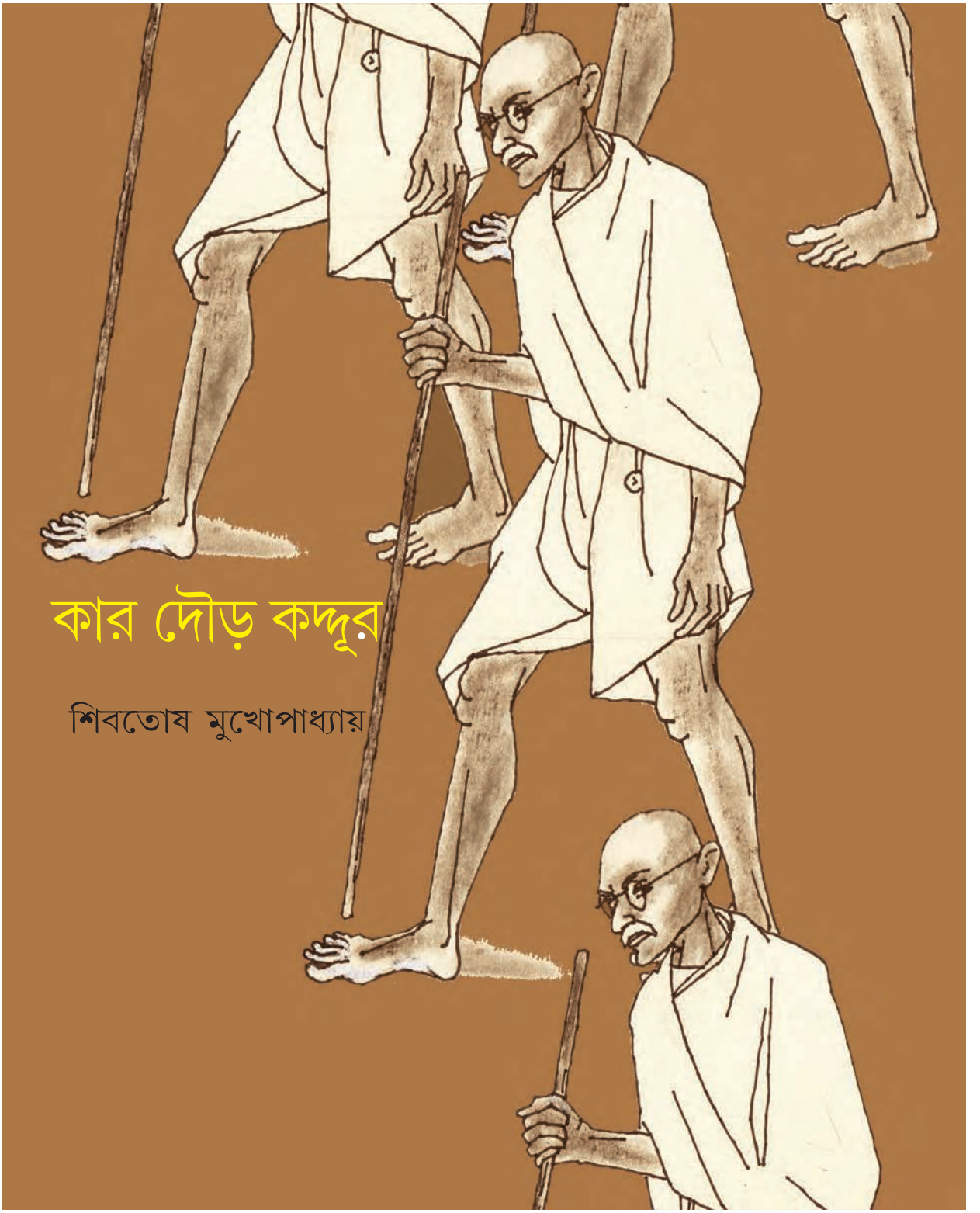

কার দৌড় কদ্দূর

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

দুরের দৌড় তার গর্তের পানে। নদীর দৌড় সাগরে। খবরের দৌড় কানের দিকে। আঘ্রাণের দৌড় নাকের দিকে। সুন্দরের দৌড় স্বভাবত বিদ্যার দিকে। খদ্দেরের দৌড় দোকানের দিকে। রোগীর দৌড় ডাক্তারের কাছে। সুখের দৌড় দুঃখের দিকে। দুঃখের দৌড় সুখের দিকে। জন্মের দৌড় মৃত্যুর দিকে আর মৃত্যুর দৌড় জন্মের দিকে। প্রত্যাশীর দৌড় মরীচিকার পিছু-পিছুতে। আপেল দৌড়ায় মাটির দিকে। গাছ মাত্রেই দৌড়াতে নারাজ। আর প্রায় সমস্ত প্রাণীই চলতে সক্ষম। গাছরা দৌড়ায় না। তার বোধহয় সবচেয়ে বড়ো কারণ যে তারা এক জায়গায় ঠায় বসে বসেই খাবার তৈরি করতে পারে। কিন্তু প্রাণীদের এক জায়গায় বসে খাবার তৈরি করবার মতো নিজেদের কোনো ভিয়েন নেই। প্রাণী মাত্রকেই খাবার সংগ্রহ করতে হয়। এই কারণেই প্রাণীরা এক জায়গায় স্থাণু না হয়ে দিকে দিকে পরিভ্রমণ করে। রসনা রটনা করে এদিকে কিংবা ওদিকে। তা বলে দুনিয়ার সব প্রাণীই কুইক মার্চ করে খেতে দৌড়য় না। কেউ কেউ দৌড়য় আস্তে কিংবা জোরে — আপনার কৃতিত্বে কেউ বা গা দিয়ে কেউ বা পা দিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায়।

অণুবীক্ষণের তলাকার অদ্ভুত বিস্ময়ের জীব অ্যামিবা, যার দেহ বলতে একখানি সেল ছাড়া কিছু নেই, তার চলবার ভঙ্গিটি বড়ো মজার। নিজের দেহ থেকে অর্থাৎ সেল থেকে খানিক অংশ ক্ষণিকের পা হিসাবে আগিয়ে দেয়, সেইদিকে তারপর সেলের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমের বাকি অংশকে গড়িয়ে দেয়, এমনি করে মুহুর্মুহু ক্ষণিক-পা বার হয় আর প্রোটোপ্লাজম সেদিকে বয়ে যায়। কত মন্দগতিতে অ্যামিবা যে চলে তা একরকম অনুমানই করা যায় না। যখন আকাশে একটি জেট প্লেন ঘণ্টায় কয়েক শো মাইল বেগে চলছে তখন অ্যামিবা কয়েক মিনিটে কয়েক মিলিমিটার অতিক্রম করতে পারছে। রক্ষে এই যে সৃষ্টির আদিকাল থেকে অ্যামিবা এমন করেই চলেছে— একেবারে কখনও থেমে যায়নি। আমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে একরকম ভবঘুরে সেল আছে যারা অ্যামিবার মতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে। এরা শরীরের সৈন্য সামন্ত। বহিঃশত্রুকে নাশ করতে ছুটে যায়। এ ছাড়া আর একরকমের এককোষী জীব প্যারামোসিয়াম— তার সেলের চারদিকে ছোটো ছোটো চুলের মতো বহিরাংশ আছে। তাদের সিলিয়া বলা হয়। এই সব সিলিয়ার যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে প্যারামোসিয়াম জলের মধ্যে হাজার দাঁড়ে নৌকা চালানোর মতো আগাতে বা পিছুতে পারে।

গমনাগমনের প্রকৃত মাধুর্যটা আমাদের চোখে পড়ে সাধারণত উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে। সমুদ্র স্রোতের সঙ্গে কত সামুদ্রিক জীব গা ভাসিয়ে মাইলের পর মাইল পাড়ি দেয় তার হিসাব আমরা রাখি না। চিংড়িরা দাঁড়া নাড়া দিয়ে চলে। কোনো কোনো পতঙ্গ উড়বার সময় তাদের ডানা প্রচণ্ড জোরে নাড়ে। এফিড উড়বার সময় প্রতি সেকেন্ডে চারশোবার ডানা নাড়ায়, আর এক নাগাড়ে আট মাইল পথ উড়ে যেতে পারে। বাগানের শামুকরা চলে তাদের একখানি মাংস-পুরু পা দিয়ে, চলে যাবার সময় রেখে যায় জলীয় চিহ্ন— তা দেখলে বলতে ইচ্ছে করে 'এ পথে আমি যে গেছি।' উচ্চতর জীবদের মধ্যে গমন শক্তির অনেক কলা কুশলতা। কিন্তু গমন শক্তিকে বিচার করতে হয় সব সময় দৈহিক ওজনের পরিমাণ হিসাব করে। কত ভারী জন্তু কত ওজন নিয়ে কত সময় কত দূর গেছে তাই বিবেচ্য। হাল্কা কোনো পাখির হাওয়ায় তিরের মতো ছুটে চলে যাওয়া আর বেজায় ওজন নিয়ে একখানি হিপোর কাদা ভেঙে থপ থপ করে যাওয়া একরকম মনে করলে ভুল হবে।

এই ধরুন, চিতা বাঘের দেহের ওজন একশো তিরিশ পাউন্ডের মতো। সে ঘণ্টায় ৭০ মাইল পর্যন্ত দৌড়াতে পারে। নেকড়ে প্রায় একই ওজনের হলেও তার গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ৩৬ মাইল মাত্র। সেই তুলনায় হিপোর শরীরের ওজন আঠাশশো পাউন্ড এবং সে প্রতি ঘণ্টায় ২০/৩০ মাইল চলতে পারে।

গোবি মরুভূমিতে গ্যাজেলি নামক এক হরিণ আছে তার গতিশক্তি অত্যধিক। দেহের ওজন আশি পাউন্ড কিন্তু সে ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে চলতে পারে। এন্টিলোপ হরিণ ঘণ্টায় ৪৫ মাইল বেগে দৌড়ায় ১১০ পাউন্ড ওজন নিয়ে। সেই গল্পে আছে কচ্ছপের কাছে খরগোশ দৌড়ের বাজিতে হার মেনেছিল। নানা জাতের খরগোশের